সর্ব্বানন্দের দিব্যজীবন

শ্রীননীগোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ
কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থ,
সাহিত্য শাস্ত্রী, ন্যায়ালঙ্কার

SARBBANANDERA DIBYAJIBA

সর্ব্বানন্দের দিব্যজীবন

শ্রীননীগোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ
কাব্য ব্যাকরণ তর্কতীর্থ,
সাহিত্য শাস্ত্রী, ন্যায়ালঙ্কার

প্রকাশক :
শ্রীবীরেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী
'মেহারেশ্বরী ভবন'
৮।৭ এ, বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২

SARVANANDER DIVYAJIVAN

By

NANIGOPAL SIDDHANTABAGISH, Nyayalankar,

Sahitya Sastri, Kavya-Vyakaran-Tarkatirtha

Published by :

BIRESH CHANDRA ROYCHOUDHURY

'MEHARESWARI BHAVAN'

8/7 A, Bijoygarh, Calcutta-700 032

ভূমিকা

সাধারণ মানুষের জীবনীর সঙ্গে মহাপুরুষবর্গের চরিত কথার পার্থক্য আছে। পার্থক্যের প্রধান হেতু উভয়ের জীবনযাত্রার। আরো গভীরভাবে জীবনাদর্শের স্বাতন্ত্র্য। সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্ত কাম-কাঞ্চন বলয়িত, তার পৌরুষের চরিতার্থতা, ঐহিকধনৈশ্বর্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মহাপুরুষের জীবন বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে ধর্ম তথা আধ্যাত্মিক অন্বেষা, থাকে ত্যাগ মুমুক্ষা ও ভূমানন্দ অর্জনের দুর্জয় সংকল্প ও সাধনা।

শুধু ব্যাপ্তি ও গভীরত্বের দিক থেকেই নয়—চারিত্র্য ও অন্তর্নিহিত এষণার দিক থেকেও সাধারণ জীবনী ও চরিত কথার মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট।

এইজন্য জীবনী লেখক ও চরিতকার এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থকারের কর্মধারা এবং দায়িত্বও আলাদা। সার্থকনামা সামাজিক মানুষের চরিত্রের উপাদান—পারিবারিক উত্তরাধিকার, শিক্ষা ক্ষেত্র, কর্মজগৎ। সামাজিক ক্রিয়াকর্মাদির বিবরণ সুলভ—মহাফেজ খানায় সবখবরই পাওয়া যায়। এই বাহ্যিক তথ্যের ইষ্টক দিয়েই তৈরী হয় জীবনী সৌধ। কিন্তু মহাপুরুষ তথা অধ্যাত্ম জীবনের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ ঘটনাও গৌণ উপাদান। মুখ্য উপাদান নিহিত থাকে বহির্জীবনের অন্তরালে। দুশ্চর সাধনার গভীরে অন্তলীন বিচিত্র সব উপলব্ধির মধ্যে। কোন্ সংবাদপত্রে বা মহাসংরক্ষণশালায় হদিশ মিলবে তার? তাছাড়া আছে বাহ্য ঘটনার স্বল্পতা ও সংঘটনার আকস্মিকতা।

কার্য কারণ সূত্র অনুধাবনের অলসতার জন্য এই বিস্ময়কর আকস্মিকতাগুলি প্রায়শঃ অলৌকিক যাদু ও অবৈজ্ঞানিক প্রহেলিকা নামে ভর্ৎসিত হয়। সর্বোপরি এই সব মহাপুরুষ

একান্তভাবে প্রচার বিমুখ। অনুগত জিজ্ঞাসু বা শিষ্যের প্রয়োজনে ক্বচিৎ এক-আধটু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেন। আবার তাও শ্রোতা বা গ্রহীতার আধার ও অধিকারে শর্তাধীন, এই সব সীমাবদ্ধতা নিয়েই চরিত কথা রচিত হয়।

নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রের উদয়ের কিছুকাল পূর্বে অনুমান পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে পূর্ববঙ্গে মেহারে আবির্ভূত হয়েছিলেন তন্ত্রাচার্য সর্বানন্দনাথ। নানা কদাচার দুর্নীতি, অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা পীড়িত হিন্দু সমাজকে কলিকালে ভাগবতী ভক্তিধারার 'হরেনামৈব কেবলম্' ঔষধ দিয়ে ব্যাধিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন চৈতন্যদেব। কাল প্রবাহে শুদ্ধ সত্যের অঙ্গে যে মালিন্য আসে, বিকৃতি দেখা দেয়, তা পরিমার্জনার জন্য সেই সেই ধারায় ঈশ্বরস্বরূপ মহাপুরুষগণ অবতরণ করেন ও ধর্মসংস্থাপন করেন। তন্ত্রধারারও অধঃপাত ও বিকৃতি থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য 'আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ'—এই বাণী ও বিশ্বাস নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীমৎ সর্বানন্দনাথ। তিনি সাধনা বলে মায়ের কৃপায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর সমকালে সুবিখ্যাত তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম মনে রেখেও বলতে দ্বিধা নেই যে নিজ কর্মক্ষেত্র ও সাধনায় শ্রীমৎ সর্বানন্দনাথ অগ্রদূত ও অনন্য।

প্রসঙ্গতঃ সর্বানন্দনাথ ও চৈতন্যদেবের জীবন প্রবাহ ও কর্মধারার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে বেশ খানিকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। গয়াধামে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গের ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্রলাভ ও বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শনে মুহূর্ত মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ততা এবং নবজীবন লাভের সহিত নির্বোধ সর্বানন্দের সঙ্গে অবধূতের সাক্ষাৎকার, মন্ত্রপ্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ এবং একরাত্রির মধ্যে মহাতান্ত্রিকরূপে প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তুলনীয়। উভয়েই দুই সংসার করেছেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। কাশীধামে

দণ্ডী সন্ন্যাসীগণের সহিত বিরোধ ও স্বমত প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও স্মরণীয়। মহাপ্রভু অন্তর্হিত হন ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীধামে এবং তা এখনো রহস্যাবৃত, আর কাশীধামে থেকে ৫০ বৎসরের পর হিমালয় অভিমুখে গমন করেন সর্বানন্দ, তাঁরও অন্ত্যজীবন রহস্যময়। সর্বানন্দনাথ সম্বন্ধে এযাবৎ যে কয়খানি চরিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার গঙ্গোত্রী—সর্বানন্দাত্মজ শ্রীমৎ শিবনাথ ভট্টাচার্য রচিত সংস্কৃত কাব্য 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী'।

এই চরিতকথা ধারায় একটি অভিনব সংযোজন 'সর্বানন্দের দিব্যজীবন'। গ্রন্থখানির লেখক কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন সাহিত্যাধ্যাপক কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ শ্রীননীগোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়।

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে চরিত গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে যে সতর্ক উক্তি করা হয়েছে—সেই সূত্রে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে চরিতকার সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কেবল নানা শাস্ত্রে সুপন্ডিত পারঙ্গম অধ্যাপক মাত্র নন, তিনি স্বয়ং ক্রিয়াবিদ্, অধ্যাত্মপথের পরিব্রাজক। সর্বোপরি সর্বানন্দ নন্দন শ্রীমৎ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিত 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী' নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থের তিনি অনুবাদক এবং ততোধিক শ্রীমৎ সর্বানন্দ বিরচিত 'সর্বোল্লাস তন্ত্রে'র (দুই খণ্ডে) 'উল্লাস প্রকাশ' নামক সরল বঙ্গানুবাদক।

এই দিক্ থেকে সর্বানন্দ সাহিত্যের শ্রদ্ধাশীল গবেষকরূপে সর্বানন্দ চরিত কথা 'সর্বানন্দের দিব্যজীবন' গ্রন্থ রচনার সর্বাপেক্ষা পারঙ্গম ও অধিকারী ব্যক্তিত্ব। মেহার, সেনহাটী, বারাণসী ও দেবতাত্মা হিমালয় শিরোনামে চার অধ্যায়ে নাতিবিস্তৃত এই গ্রন্থরত্নের মধ্যে সুললিত ভাষায় ঘটনার বিবরণ ও বিশ্লেষণ ছাড়াও লেখকের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও সুগভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন সুস্পষ্ট। সর্বানন্দ চরিত পর্য্যায়ে এখন পর্যন্ত 'সর্বানন্দের

দিব্যজীবন' গ্রন্থখানিই সর্বশেষ সংযোজন, কাজেই তথ্যও তত্ত্বের সমাহারও সমধিক।

এই দিব্যগ্রন্থের ভূমিকা রচনার সারস্বত অধিকার সম্বন্ধে আমার সীমাবদ্ধতায় সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও যে অনধিকার চর্চা করেছি, তা কেবল বিষয়ের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও লেখকের প্রতি সুগভীর প্রীতি বশে। এতে সঙ্কোচ অপেক্ষা গৌরব বোধ সমধিক। মহৎ কর্মের প্রতি অকপট প্রণতি জানাবার আনন্দ তো মহৎ প্রাপ্তি। আমি ভরসা রাখি যে গ্রন্থখানি শুধু সর্বানন্দ ভক্তদের নিকট নয়, বাংলা চরিত সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করবে।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

কাব্য-পুরাণতীর্থ, এম, এ ; পি-এইচ, ডি-
প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ
বাংলা বিভাগ এবং কলাবিভাগের
ডীন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

'চক্রতীর্থ'
১৭ ডি/১ এ, রাণী ব্রাঞ্চ
রো, পাইকপাড়া
কলিকাতা

মুখবন্ধ

অনুরোধ আসিয়াছিল সুহৃদ্‌বর শ্রীবীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের স্মরণে সপ্তম বর্ষে অনুষ্ঠিত সিদ্ধ্যুৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশনার জন্য গ্রন্থ প্রণয়নের। শ্রীরায়চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে এবং তন্ত্রাচার্য্য সর্বানন্দদেবের কৃপায় প্রতি বৎসরই পৌষ সংক্রান্তিতে সর্বানন্দ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। শরীর অসুস্থ, তাই মানসিকভাবে অনুরোধে সাড়া দিতে ভয় হইল কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অগাধ নিষ্ঠার বশে এবং 'হয়ত এই বারই শেষ বার'—এই বুদ্ধিতে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের জীবনী—ভাবিতেছিলাম, কিভাবে আরম্ভ করি। শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী' আমার কাছেই ছিল। সর্বানন্দদেবের জীবন সম্পর্কিত প্রামাণ্য গ্রন্থ একমাত্র 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী', যিনিই সর্বানন্দের উপরে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই গ্রন্থ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শ্রীরায় চৌধুরী মহাশয় মেহাররাজ জটাধরের উত্তর পুরুষ। মনেরী দক্ হইতে বার্দ্ধক্য না আসিলেও বয়োবৃদ্ধ এই রাজপুরুষের নিকট সর্বানন্দের দিব্যজীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার সংবাদ জানিতে পারি। ইহাই সূত্রাকারে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, আমি বৃত্তি, টীকা, টিপ্পনী সহযোগে রচনা কুসুমের ডালাটি তান্ত্রিক-শিরোমণি শ্রীমৎ সর্বানন্দ চরণে অর্পণ করিয়াছি।

চরিত কথা লিখিতে বসিলেই ব্যক্তি জীবনের—মাতা পিতা, জন্মস্থান, বংশপরিচিতি, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, কর্মস্থান, বিবাহিত জীবন, স্ত্রী পুত্রাদি ইত্যাদি অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়ে কিন্তু আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের ক্ষেত্রে এ সমস্ত বিষয়ের অপ্রতুলতা বিশেষ করিয়া শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

প্রথমাবধি ৩৮ বৎসর পর্যন্ত চরিত প্রণেতৃগণের নিকট এমন কিছু বিশেষ তথ্য আছে কি যাহাকে তত্ত্ব হিসেবে রচনার উপযোগী বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়। ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম, তারপর বারাণসীতে স্বল্প কয়েক দিন অবস্থান তৎপরে অন্তর্ধান। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের সন্ধান এখনও অজ্ঞাত। সুতরাং সর্বানন্দদেবের তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ জীবন চরিত রচনা কিভাবে সম্ভব হইবে। তাই রচয়িতা হিসেবে আমার কৈফিয়ৎ 'সর্বানন্দের দিব্যজীবন' গ্রন্থে কোথাও কোথাও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে, অবশ্য যদি সেরূপ ঘটিয়াও থাকে, পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াই উহার উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

'সর্বানন্দের দিব্য জীবন' গ্রন্থে কিছু কিছু স্থলে পাঠক মনের জিজ্ঞাসাকে, অদম্য কৌতূহলকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য, যিনি 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী'-কার, আবার শ্রীমৎ সর্বানন্দ-পুত্র, তাঁহার নিকট কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। উত্তর ও মীমাংসার জন্য জীবনীকার যুক্তি, বিচার বিশ্লেষণ এবং প্রভূত কিম্বদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইগুলি সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য হইবে এরূপ প্রত্যাশা (গ্রন্থকার) করিতে পারে না। যথা সম্ভব সহজ ও সরলভাবে ঘটনা প্রবাহের গতিকে সঠিক ধারায় নির্দিষ্ট বিন্দুতে পেঁাছাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

লৌকিক জীবনে বাস্তব বুদ্ধিতে অনেক ঘটনাই 'আজগুবী' বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মিলে না'— এরূপ একটা কথা সমাজে প্রচলিত আছে। অলৌকিক কাহিনী, দৈববাণী, অভিসম্পাতে অনিষ্ট সংঘটন ইত্যাদি বিষয়গুলি পাঠককে ধাঁধায় ফেলিতে পারে কিন্তু যোগবলে, যৌগিক প্রক্রিয়ায়, অঘটন ঘটন পটীয়সী লীলাময়ীর লীলায় কতশত ঘটনা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায়, মুনি-ঋষিদের মননে চিন্তনে, আচার আচরণে স্থান করিয়া নিয়াছে—তার কতটুকু সংবাদ আমরা রাখি? ঐ রহস্যের কতটুকু আমরা জানি।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের কায়-পরিবর্তনের ঘটনাটি কি আমাদের বিশ্বাসে 'চিড়' ধরাইতে যথেষ্ট নয়! আবার বলি—অলৌকিক ঘটনাবলীর চুলচেরা বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। অনেকেই ইহাতে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। পন্ডশ্রম করিয়া অবশেষে কষ্ট অনুভব করিয়াছেন।

এই গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখিবার জন্য অধ্যাপক ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। 'দোষজ্ঞ' ইহার পর্যায়বাচক শব্দে 'পন্ডিত'কে বুঝাইয়া থাকে কিন্তু ডঃ চক্রবর্ত্তীকে এই বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখিলে আমি ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট বোধ করি। অপরকে নিজের মত করিয়া, স্নেহ-মমতা প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া নিতে 'তাঁর জুড়ি' কোথায়। এই নিরভিমান বিদ্বান ব্যক্তিত্ব গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখিয়া আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার পান্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা মুদ্রণের পর দীর্ঘ হইবে ভাবিয়া প্রকাশকের অনুরোধে হ্রস্ব করিতে বাধ্য হইয়াছি। এজন্য আমি ডঃ চক্রবর্ত্তীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ইতঃ পূর্বে আমার সম্পাদিত দুইখানি গ্রন্থ—'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী' ও 'সর্বোল্লাস তন্ত্র' (বঙ্গানুবাদ সহ) প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্বৎ সমাজ এবং সাধক সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকগণের নিকট হইতে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পাইয়াছি। এই গ্রন্থের শেষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সমালোচক পন্ডিতপ্রবর শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের গ্রন্থ দুইটি সম্বন্ধে, সুচিন্তিত অভিমত মুদ্রিত হইয়াছে। সুধীগণ ইহা হইতে শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের মনীষার কিছুটা পরিচয় পাইবেন।

আশাকরি 'সর্বানন্দের দিব্যজীবন' গ্রন্থ পাঠে শ্রদ্ধাশীল পাঠক ও সর্বানন্দ-ভক্তকুল পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের পুণ্যচরিত-কথা শ্রবণে, মননে, স্মরণে কীর্তনে মানসিক শান্তি পাইবেন।

পরিশেষে একটি স্বীকার উক্তি—গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিবার পর আমি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ি। সময়ও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। প্রতিনিয়তই মনে হইত—'ঐ যে পৌষ সংক্রান্তি আগত প্রায়'। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শুভেন্দু এই সময় আমার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে দ্রুত নিরাময় করিয়া তোলে। আমি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠি। লাইব্রেরী হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ, 'প্রেস কপি' তৈয়ারীতে সাহায্য করিয়া আমাকে অনেকটা চিন্তামুক্ত করিয়াছে। প্রার্থনা করি—শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের আশীর্বাদে সে জীবনে সাফল্য অর্জন করুক, সুখী ও নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করুক।

'তর্কতীর্থ নিবাস'
৩৬/৩ বেনিয়াটোলা লেন,   শ্রীননীগোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ
কলিকাতা-৯
পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৯৬

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের অশেষ কৃপায় পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য দিবসে 'সর্বানন্দের দিব্যজীবন' গ্রন্থের প্রকাশ হইল। এই গ্রন্থে তান্ত্রিক চূড়ামণি সর্বানন্দদেবের জীবনের দিব্য-বিচিত্র কাহিনী এবং গ্রন্থকারের নিজস্ব উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গ্রন্থকার পন্ডিতপ্রবর শ্রীননীগোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ইতঃপূর্বে শ্রীমৎ শিবনাথ প্রণীত 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী'র ভাবানুবাদ এবং শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব তান্ত্রিকচূড়ামণি কৃত সর্বোল্লাস তন্ত্রের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ (দুই খন্ডে) সম্পন্ন করিয়াছেন। অনুবাদ সৌকর্য্য গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য। ইহাতে সংস্কৃত না জানা জিজ্ঞাসু বিদ্বান পাঠক মূলগ্রন্থের বিষয়বস্তু অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

'মেহারেশ্বরী ভবনে' শ্রীমৎ সর্বানন্দ সিদ্ধিদিবস স্মরণ উৎসবে প্রতিবৎসরই সর্বানন্দদেব সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

মেহারের দাস-রাজবংশ ও সাধক সর্বানন্দ, মেহারের দাস-রাজবংশ ও সাধক সর্বানন্দ (সংযোজনা খন্ড), সর্বানন্দ তরঙ্গিণী (বঙ্গভাষায় ভাবানুবাদ সহ); সর্বোল্লাসতন্ত্র (১ম) [বঙ্গভাষায় অনুবাদ-উল্লাস প্রকাশ সহ]; সর্বোল্লাসতন্ত্র (২য়) [বঙ্গভাষায় অনুবাদ-উল্লাস প্রকাশ সহ]; রাজগুরু সর্বানন্দ; এবং বর্ত্তমান সপ্তম বর্ষে 'সর্বানন্দের দিব্যজীবন' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের জীবনের বহু ঘটনাই আজও অজানা রহিয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক এই সাধকের লৌকিক, অলৌকিক বহু কাহিনী কিম্বদন্তী ছড়িয়ে আছে বাংলার শহরে গ্রামে, এমন কি মেহার ও তৎ সংলগ্ন গ্রামগুলির গ্রাম বৃদ্ধদের মুখে মুখে।

এই গ্রন্থে অনেক অজানা বিষয়ের উপস্থাপনা করা হইয়াছে। ভক্ত হৃদয়ের বহু আকুলতা গ্রন্থটিকে সহজ সরল ও উচ্ছ্বাসময় করিয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করি। এই পরিণত বয়সেও তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা না করিয়া গ্রন্থ প্রণয়নে স্বীকৃতি দান করিয়া—আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হউক—এই প্রার্থনা করি।

শ্রীবীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

'মেহারেশ্বরী ভবন'
৮/৭এ, বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯২

লিঙ্গোপরি শবারূঢ়ঃ সর্বানন্দো মহামতিঃ।
প্রজপেৎ স্বমনুং ভক্ত্যা নিশ্চিন্তো নির্ভয়ো যতঃ ।।
ততশ্চ পরমা বিদ্যা ভক্তস্যানুগ্রহায় বৈ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস কাল্যাদিদশরূপকম্ ।।

মেহারে জীনমূলে বিবিধতমযুতে পৌষমাসস্য চান্তে
শুক্রে রাত্র্যর্দ্ধভাগে ত্রিভুবনজননী চাপ্রকাশা প্রকাশা।
ধ্যায়ন্ তাং যোগগম্যাং শবহৃদি প্রবিশন্নুক্তমন্ত্রপ্রজাপাৎ
সর্ব্বাশা পূর্ণকামা মনইত বরদা সুপ্রসন্না ভবেৎ সা॥

সর্বানন্দের দিব্যজীবন

॥ মেহার ॥

পুণ্যশ্লোক সাধক সর্বানন্দ। সাধক চূড়ামণি সর্বানন্দ। মহাতাপস সর্বানন্দ। দীর্ঘ সাধনা, উগ্র তপস্যা, কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস, জপ ধ্যান হোমে ইষ্ট চিন্তায় কালাতিপাত—এসবের কোন নির্ভর যোগ্য সংবাদ বা প্রমাণ আমাদের জানা আছে কি? এমন একজন মহাত্মার জীবন কাহিনী আলোচনা করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইবার দুর্বার প্রয়াস। ইহাকে বামনের আকাশ স্পর্শ বা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মত উপহাসের বিষয় বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু সেই সর্বকারণ-কারণের কৃপায় সমস্তই সম্ভব।

আমাদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কে সেই পূত, পবিত্র, লোকপাবন মহামানব। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্য আবির্ভাবে কোন্ জনপদ ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার পিতা মাতার নামই বা কি? কোন্ প্রদেশ জন্ম সূত্রে তাঁহার প্রথম দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিল।

স্মৃতি শ্রুতি বেদ পুরাণ এমন কোন সার্থকজন্মা দেব চরিত্রের ইতিবৃত্ত কি আমাদের দিতে পারে, যাঁহাকে জগজ্জননী ভবতারিণী 'মম ত্বমেব নিয়তঃ পুত্রঃ'—তুমিই আমার নিয়ত পুত্র, তোমাকে পুত্র রূপে স্বীকার করিলাম।

যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কাশীর দণ্ডী স্বামী আর্তি জানাইয়া বলিয়াছিলেন—তোমাকে আশ্রয় করিয়া, তোমাকে ভজনা করিয়া ত্রিতাপ দগ্ধ জীবকুল ভাগ্যশালী হইবে, দেহান্তে অক্ষয়স্বর্গ লাভের অধিকারী হইবে। আমি অতি সাধারণ, অবিদ্যা এবং দন্ডী-জীবনের বৃথা আচার আচরণ ও অহংকারের অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আমাকে ভক্তিমান কর। হে শুদ্ধস্বরূপ মহাপুরুষ, বার বার তোমাকে

নমস্কার করিয়া বলিতেছি 'ত্বমীশস্ত্বমীশঃ'—তুমিই সাক্ষাৎ ভগবান্। কলিতে মুক্তিমার্গ প্রদর্শনে তুমিই একমাত্র পথ প্রদর্শক।

কে সেই অতিমানব। যাঁহার বাক্য অর্থকে অনুধাবন করে। 'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থমনু ধাবতি'। স পারিষদ্ রাজা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট পূজক বলিয়াছিল—'আজ পূর্ণিমা' অথচ অমাবস্যায় মায়ের পূজা। ইহাই'ত বংশ পরম্পরা। উপস্থিত জনগণের তির্যক দৃষ্টি ও কটূক্তি পূজককে বিচলিত করে নাই। তিনি কিছু বলিতে চাহিলেন কিন্তু কে কার কথা শোনে, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'—মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ উক্তির মত পূজকের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। তথাপি সকলকে বিস্ময় বিমূঢ় করিয়া বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন—আমার জীবনে আর তিথি নক্ষত্র যোগ করণ বা নির্দিষ্ট পঞ্চাঙ্গের বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকার কি প্রয়োজন, প্রয়োজন চিন্ময়ীর প্রত্যক্ষ দর্শন। অ (অরে) মা (জগন্মাতা আমার) বস্যা (বশীভূত হইবেন, আমাকে আশ্রয় দিবেন)। সুতরাং আজ পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্র আমার জীবনে দেখা দিয়াছে। আমার হৃদাকাশে পূর্ণ চন্দ্র সদা দীপ্যমান, আমার জীবনের ঘোর অন্ধকার আর নাই। আলোর আরাধনা কর। কে সেই যোগী পুরুষ, এমন দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন, ভুবনমঙ্গল মাতৃ নাম আশ্রয় করিয়া সর্ববিদ্যা সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

জনশ্রুতি—আজও সেই মহাত্মা জীবিত। তিনিই কি আমাদের পরম আরাধ্য সিদ্ধপুরুষ, মহাসাধক, সর্বানন্দ ?

চন্দ্রনাথ ধামে অবস্থানরত ঈশ্বর প্রেমী সত্যনিষ্ঠ গুরু কৃপাধন্য গমন্তিবন্ বাবাজীর জবানীতে একটি প্রশ্নাতীত তর্কাতীত কাহিনী আপনাদের গোচরে আনিতেছি।

"হিমালয়ের এক সুরম্য প্রদেশে তুষার ধৌত, সিদ্ধ মুনি সংঘ সংসেবিত শান্ত পরিবেশে, এক মনোরম ভূখণ্ডে আমাদের গুরুদেবের আশ্রম। আমরা কয়েক জন শিষ্য গুরু সন্নিধানে

থাকিয়া যথারীতি যথাশাস্ত্র সাধন ভজন পরম তত্ত্বালোচনায় ইষ্টলাভে ব্রতী।

অকস্মাৎ একদিন দিব্যকান্তি, বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী আশ্রমে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ দিব্য অঙ্গসৌষ্ঠব যেন সমগ্র আশ্রমকে দিবাকর করোজ্জ্বল করিয়া তুলিল। দর্শনমাত্রই গুরুদেব প্রণামান্তে আসন গ্রহণের সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ দিব্যপুরুষ আসনস্থ হইয়া আমাদের গুরুদেবকে বলিলেন—'সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি দেহ পরিবর্তন করিব। এজন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি'।

বৃদ্ধ তপস্বী ধ্যানস্থ। এই সময় উপর হইতে একটি সুগোল পদার্থ তপস্বীর সম্মুখে পতিত হইল। ইহা করকমলে স্থাপন করিয়া নিমেষ মাত্র নিরীক্ষণ করতঃ আমাদের গুরুদেবকে তাঁহার দেহ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিলেন। গুরুদেব অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি ঐ সুগোল পদার্থটির এক তৃতীয়াংশ মুখে পুরিয়া আমাদের সম্মুখেই আশ্রম প্রাঙ্গণে শুইয়া পড়িলেন। তখন ঐ বৃদ্ধ মহাযোগীর দেহ হইতে মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। আমাদের চোখের সামনেই যোগীবরের দেহ হইতে এক যুবা পুরুষের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিলাম। বৃদ্ধ তপস্বীর সহিত যুবা পুরুষটির আকৃতির, দেহের গঠনের অপূর্ব সাদৃশ্য। আমাদের গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দিব্যকান্তি নবীন যুবা প্রস্থান করিলেন। গুরুদেবের আদেশে আমরা হিমালয়ের পবিত্র তুষার গলিত প্রদেশে দেবতাত্মা গিরিরাজের ক্রোড়ে বৃদ্ধ তপস্বির পরিত্যক্ত জীর্ণ দেহটি সমাহিত করিলাম।

হায়, এভাবে কত, কত, না যোগীর দেহ গিরিরাজ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। অগণিত সাধু সন্ন্যাসীর এতাদৃশ দেহ পরিবর্তনের কাহিনী আমাদের পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ সাক্ষ্য বহন করিয়া

চলিয়াছে। এ প্রক্রিয়া একমাত্র ভারতীয় যোগীদের আয়ত্তে। উচ্চকোটি সাধনার ফল—হাজার হাজার বৎসর দেহ ধারণ এবং পরমের উপাসনায় সিদ্ধির চরমে উত্তরণ।

আমরা গুরুদেবের নিকটে ঐ যোগীবরের পরিচয় জানিতে চাহিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলাম—গুরুদেব, আমাদের বড় কৌতূহল। কে এই সন্ন্যাসী! রহস্যময় এই ঘটনার প্রেক্ষাপটই বা কি? আমাদের বলুন।

গুরুদেব বলিলেন—ইনি বঙ্গ প্রদেশের মেহার নামক স্থানের সিদ্ধ মহাপুরুষ সর্বানন্দ ঠাকুর। দেহ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসি। সর্বানন্দ ঠাকুর বহুবার এরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীন শরীর ধারণ করিয়াছেন।"

আমরা এতক্ষণ হেয়ালীর মধ্যে সর্বনাম পদে বিশেষিত করিয়া যে মহাত্মাকে স্মরণ মনন করিয়া আসিতেছিলাম—তিনিই শ্রীমৎ সর্বানন্দ। সর্বানন্দ ঠাকুর। মেহারের সর্ববিদ্যা, সাধক চূড়ামণি, রাজগুরু সর্বানন্দ। 'পৌত্রঃ বাসুদেবস্য'। বাসুদেবের পৌত্র।

মেহারের জীনমূল শ্রীমৎ সর্বানন্দ দেবের সাধনার সিদ্ধ পীঠ। এই পবিত্র পীঠ ভূমিতেই, তিনি দাসরাজ জটাধরের সময়ে মাতৃদর্শনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধিলাভ বৃত্তান্ত যেমন কৌতুক-প্রদ তেমনই রোমহর্ষক এক আত্যাশ্চর্য ঘটনা। মহাত্মা সর্বানন্দের দিব্য জীবনের প্রকাশিত কিছু তথ্য সমৃদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। কালের দীর্ঘ ব্যবধানে অনেক তথ্যই আমাদের আজ অজানা। ইহা নিঃসন্দেহে শ্রেয়স্কর, পাপহারক এবং পুণ্যদায়ক।

নবদ্বীপ কুলচন্দ্র মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সম সাময়িক এই মহাত্মার জীবন বৃত্তান্তের নির্ভর যোগ্য প্রামাণ্য দলিল আমাদের হাতে নাই। সর্বানন্দ পুত্র শিবনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী' একমাত্র আশ্রয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোকাকারে, এই গ্রন্থের

ভাবানুবাদ করিয়াছেন পণ্ডিত শ্রীননীগোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ (১৩৯৪)। সর্ববিদ্যা শিষ্য ভক্তিমান্ শ্রীবীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী। তিনি মেহারের বিখ্যাত দানবীর রাজা জটাধরের বংশধর। বিজয়গড় মেহারেশ্বরী ভবন হইতে গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া একটি মূল্যবান্ প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। শ্রীমৎ সর্বানন্দ দেবের অপূর্ব জীবন লীলার বহু মুহূর্তই শিবনাথ অতি নিপুণতার সহিত সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এজন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া রহিল।

বাংলা দেশ। জিলা ত্রিপুরা। ত্রিপুরা জিলায় তিনটি মহকুমা—কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। চাঁদপুর মহকুমার অধীন এই মেহার গ্রাম। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আগন্তুক মাত্রেরই মন হরণ করিত। সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র চন্দ্রনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নদীতটে একটি মনোরম স্থান দেখিতে পাইলেন রাজা সদানন্দ দাস। নৌকা তীরে ভিড়াইবার আদেশ দিয়া রাজা নৌকা হইতে অবতরণ করেন। আনুমানিক ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে। পূর্বস্থলী রাজ্যের রাজা সদানন্দ দাস আর পূর্বস্থলীতে ফিরিয়া গেলেন না। তখন হইতেই মেহারে সদানন্দ দাসের রাজ্য পাট। তিনি মেহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই বিচক্ষণ সদানন্দ অতিদক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন, প্রজাপালনে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজ সভায় বিশিষ্ট গুণী, শিল্পী, আস্তিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বেদজ্ঞ পণ্ডিত এবং প্রার্থীরা সমাদৃত হইত। প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিয়া রাজা কর্তব্য পালন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেন না। তাঁহার দানের কথা, বন্ধু বাৎসল্যের অজস্র ঘটনা, আশ্রিতকে সমাদরে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের কথা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া তখন মেহাররাজ্যে 'সদানন্দ' এক কিংবদন্তী পুরুষ রূপে চিহ্নিত হইলেন।

পরবর্ত্তিকালে সম্রাট আকবরের শাসন সময়ে 'মেহার রাজ্য' সুবে বাংলার একটি মহালে পরিণত হয়। তদবধি এই দাসবংশ 'রাজা' উপাধি ত্যাগ করিয়া 'রায় চৌধুরী'—এই পদবীতে পরিচিত হইতে থাকেন।

সদানন্দ দাসের পুত্র রামহরি দাস। তাঁহার তিনটি পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ, তিনি অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। একদিন তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন বাসুদেব ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ। মেহারে বসবাসের ইচ্ছায় তিনি রাজ সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণের তেজোদৃপ্ত, দেবদুর্লভ আকৃতি রাজাকে বিস্মিত করিল। রাজা ভাবিলেন—ইনি সাধারণ প্রার্থী নহেন। কোন দেবদূত কি আমাকে ছলনা করিতে আসিলেন! রাজার মনে পড়িল অতীতের একটি ঘটনার। রাজা ছিলেন বিদ্বৎপ্রিয়। দেশ বিদেশের বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তির রাজসভায় সমাগম হইত। রাজাও যথাসাধ্য তাঁহাদের সম্মান করিতেন। একদিন এক পরিব্রাজকাচার্য্য—'জয়তু মহারাজ'—বলিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। রাজা যথোচিত সম্বর্ধনার পর আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। নানাবিধ শাস্ত্রালোচনার পর পরিব্রাজকাচার্য্য বলিলেন—মহারাজ, 'দাতারো বহবঃ সন্তি। গ্রহীতা চ সুদুর্লভঃ ॥ সংসারে দাতার সংখ্যা অপরিমেয় কিন্তু গ্রহীতার সংখ্যা অঙ্গুলীমেয় অর্থাৎ আঙ্গুলে গোণা যায়। পৃথিবীতে দান করিবার মত সজ্জন দাতার অভাব নাই। পক্ষান্তরে সজ্জন গ্রহীতা, গ্রহণকারীর অভাব জানিবেন। প্রকৃত গ্রহীতা জগতে দুর্লভ। সৎ পাত্রে দানই উৎকৃষ্ট দান।

আচার্য পরিব্রাজক আরও একটি মর্মস্পর্শী শ্লোক রাজাকে শুনাইলেন—

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়। শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায় ॥
খলস্য সাধো বিপরীত মেতৎ। জ্ঞানায় দানায় তথাবনায় ॥

ইহার মর্মার্থ—বিতণ্ডাপ্রিয় বিদ্বান্ অপর বিদ্বানকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আসুরিক তৃপ্তি অনুভব করেন। তাহাদের জীবনে বিদ্যা বিবাদের স্থান বলিয়া জানিবেন। ধনবান ব্যক্তি প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। ধনমদমত্ততা তাহার স্বাভাবিক জীবন, মনুষ্যত্ববোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিপন্থী, তাহাকে অশুভ পথে পরিচালিত করে। শক্তিমান্ বলশালীর শারীরিক শক্তি অপরের, দুর্বলের পীড়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সমস্তই খলব্যক্তির, দুর্জনের পক্ষেই প্রযোজ্য। সজ্জন সাধুব্যক্তির বিদ্যা জ্ঞানের জন্য, জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য। অপরকে শিক্ষিত করিবার মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সাধু সৎব্যক্তির অর্থ সৎপাত্রে দানের জন্য ব্যয়িত হয়। সেখানে থাকে না কোন মত্ততা, থাকে না কোন অহমিকা। শক্তি শুধু দুর্বলকে রক্ষা করিবার জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্য বা সংকল্প সজ্জন, শক্তিমান্ ব্যক্তির মনের কোণেও স্থান পায় না। রাজন্, এইবার আমরা স্ব স্ব স্থানে গমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। রাজসভার সমাপ্তি ঘোষিত হইল।

অন্তঃপুরে প্রবেশের প্রাক্‌কালে রাজা শিবানন্দ বাসুদেব ভট্টাচার্যের প্রার্থনা পূরণে সম্মতি প্রদান করিলেন। বসবাসের সুবন্দোবস্তের জন্য কর্মচারিদের আদেশ দিলেন।

ধন্য, রাজা শিবানন্দ। ধন্য নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাসুদেব। তোমরাই সর্বানন্দলীলার প্রকৃত সূত্রধার।

অনতিকালের মধ্যেই রাজা শিবানন্দ বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের সত্যনিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

রাঢ়দেশের পূর্বস্থলীর সিংহলদী গ্রাম। এই সিংহলদী হইতেই শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য মেহারে আসেন। স্বগ্রামে অবস্থানের সময় গঙ্গাতীরে পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন বাসুদেব দৈবাদেশ প্রাপ্ত

হন্। দৈববাণীটি অপূর্ব! জগন্মাতা ভবানী বলিলেন—'বাংলার মেহারে তোমার বংশে আমার দর্শন লাভ হইবে'। এই দৈবাদেশই বাসুদেবকে জন্মভূমি ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ভৃত্য পূর্ণানন্দ সহ সপরিবারে মেহারে চলিয়া আসেন। রাজা শিবানন্দের অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছাদনের স্বাচ্ছন্দ্য ঘটিল। ভবানীর কৃপায় আত্মচিন্তায়, তিনি পূজা জপতপেই দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন।

নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাহারও জীবন অতিবাহিত হয় না। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।' সুখ দুঃখ চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। কখনও মানুষ সুখের মুখ দেখে, কখনও বা দুঃখের আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খায়।

রাজা শিবানন্দের রাজত্বকালে প্রজাবৃন্দ নিরুপদ্রবে, পরম শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। কোন অভাব অভিযোগ থাকিলে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলে সুব্যবস্থা হইয়া যাইত। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই হৃষ্টমনে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া রাজসভা ত্যাগ করিত। রাজা শিবানন্দের বিচার পদ্ধতি এবং জনপ্রিয়তা এতই পরিচ্ছন্ন ছিল, কোন পক্ষই অতৃপ্ত হইত না। এই ছিল মেহারের রাজশাসন।

হঠাৎ একদিন একটি ঘটনায় রাজা শিবানন্দ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। রাজসভায় প্রচুর জনসমাগম হইয়াছে। রাজা প্রজাদের মনোগত ইচ্ছা বা অভিযোগ জানিতে চাহিয়া মাত্র তিনজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা—এই সভায় এত সংখ্যক লোকের উপস্থিতির হেতু কি? তোমরা কিজন্য দলবদ্ধভাবে আমার নিকট আসিয়াছ? আমি অভয় দিতেছি, অকপটে আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ কর।

একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা রাজার অভয় বাণীতে সাহসে ভর করিয়া

রাজাকে বলিলেন—মহারাজ, আপনার গুরুদেব বাসুদেব ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ভট্টাচার্য্য পরম নিষ্ঠাবান্ যোগীপুরুষ। দিবারাত্র দেবার্চনায় অতিবাহিত করেন। আহার নিদ্রার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। দেবগৃহেই শিবসান্নিধ্যে শিবপূজা ও মহামায়ার অর্চনায় দিন কাটাইতেন। আমরা সাধারণ মানুষ; কখনও কখন আশীর্বাদের জন্য তাঁহার নিকটে গিয়াছি। তিনি সকলকেই পুত্রস্নেহে আশীর্বাদ করিতেন। মায়ের নির্মাল্য দিতেন। আমরা উপকৃত হইতাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ কয়েকদিন যাবৎ আমরা আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইনা। বহু চেষ্টা করিয়াও দেখা মিলে না। আমাদের এক বন্ধু বিশেষ বিপন্ন হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এক প্রকার ধর্ণা দিয়াই দেবগৃহের দরজায় পড়িয়া রহিলেন। অনুনয় বিনয়ের অনেকক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় দরজা খুলিলেন এবং দর্শন দিলেন। বন্ধুর উক্তি—কিন্তু একি মূর্ত্তি? ইনি কি আমাদের পরম হিতৈষী, সদাব্রত রাজগুরু বাসুদেব ভট্টাচার্য্য। সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। রক্তবর্ণ নেত্রযুগল। মুখে মাতৃনাম। কাহারো দিকে চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না। যেন পড়িয়া যাইবেন। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম। মহারাজ আমাদের অনুরোধ আপনি অনুসন্ধান করুন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পানাসক্তির কথা লোকে বলাবলি করিতেছে। ইহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কি?

রাজা বলিলেন—আমি তোমাদের বক্তব্য শুনিলাম। তোমরা যে বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছ তাহা অত্যন্ত বেদনা দায়ক হইলেও আমি অনুসন্ধান করিব। সত্যাসত্য নির্ণয়ে যত্নবান হইব। মেহার রাজবংশের অমর্য্যাদা, রাজগুরুর আচরণে সংশয়—ইহার কোনটাই আমি ছোট করিয়া দেখিতেছিনা।

ইহার পরেই রাজা শিবানন্দ একদিন গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। এবং লোকমুখে গুরুর পানাহারেয় বিষয়ে সংশয়ের কথা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং ইহাও বলিলেন—আপনি পূর্বে মধ্যে মধ্যে রাজবাড়ী যাইতেন। এখন রাজবাড়ীতে যাতায়াতও আপনার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ তাহাদের আর্তি লইয়া আপনার নিকট আসিত—ইদানীং আপনি তাহাদেরও নিরাশ করিয়াছেন। আমি জানিতাম—আপনি শৈব, শিব পূজা, জপ ধ্যান, ইষ্ট চিন্তায় মগ্ন থাকেন। এখন আপনার আচরণে বীরাচারী সাধকের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে বাসুদেবের এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না। তিনি রাজাকে বলিলেন, তুমি আমার শিষ্য, তোমাকে দীক্ষা দিয়াছি। তুমি উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা নিয়াই আজ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ।

রাজা, তুমি অতি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ, তোমাকে অধিক উপদেশের প্রয়োজন নাই—মনে রাখিও—মন্ত্র মহোষধি গ্রন্থের একটি প্রসিদ্ধ উক্তির কথা—

অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভা মধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥

বাসুদেব মৌন হইলেন। ইষ্ট চিন্তায় মনকে পরমে মগ্ন করিলেন। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে গুরুগৃহ হইতে রাজা শিবানন্দ বাহির হইয়া আসিলেন। আসিলেন বটে কিন্তু অমূলক সন্দেহ তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল—একটু উপশমের আশায় দ্বার প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা শুনিতে পাইলেন—গুরুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি অভিসম্পাত দিতেছি—'অদ্য সূর্যাস্তের পূর্বেই তোমার মৃত্যু হইবে।'

কথিত আছে—রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি দীঘি খননের কাজে দুইদল 'মগ' শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। কাজ যথা নিয়মে অগ্রসর হইতেছে।

ইতিমধ্যে দুদল মগ শ্রমিকের মধ্যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বড় বিবাদের সূত্রপাত হয়। এক সময় বিবাদ এত তুঙ্গে উঠে একদল অন্যদলের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার উপক্রম। অপরাহ্নে রাজা শিবানন্দ খনন কার্য পরিদর্শনে দীঘির ধারে গমন করেন। দৈবক্রমে সেই দিনটিই ছিল গুরুদেব বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের অভিসম্পাতের কাল দিন। দুইদল মগ শ্রমিক দলপতির মাধ্যমে রাজার নিকট বিবাদ মীমাংসার আবেদন জানাইল। রাজা শিবানন্দ বিবাদের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এক পক্ষকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। এই সময় অকস্মাৎ অপরপক্ষের উত্তেজিত দলপতি একটি তীক্ষ্ন ধার কোদালীর সাহায্যে শিবানন্দের শিরশ্ছেদ করে। ভীত সন্ত্রস্ত শ্রমিকগণ ভয়ে পলায়ন করিল। খনন কার্য্য অসমাপ্ত। অসমাপ্ত খনন কার্য্য রাজা শিবানন্দের মর্মন্তুদ মৃত্যুর করুণ কাহিনীর সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। ঐ মেহার অঞ্চলের জনসাধারণ রাজা শিবানন্দের কীর্তির কথা আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে এবং সাশ্রুনেত্রে মা জগদম্বার নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করে।

সেইদিন শীতের পড়ন্ত বেলায় যে সূর্য্যদেব বিষাদগ্রস্ত হইয়া অস্তাচলে মুখ ঢাকিয়াছিল তাহাকে আমরা যথারীতি পরদিন উদয়াচলে নিরীক্ষণ করিলাম। ক্ষুদ্র বৃহৎ জাগতিক কোন ঘটনাই প্রকৃতির নিয়মকে প্রভাবিত করে না। তাই আমরা দেখি—শ্রীরামচন্দ্র স্ত্রী সীতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বন গমন করিলেন, রাজা দশরথ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন কিন্তু অযোধ্যার সিংহাসনে রাজপ্রতিনিধির অভাব কি আমরা দেখিয়াছি। আমরা কি দেখি নাই—বালী বধের পর সুগ্রীবের রাজ্যলাভ, সিংহাসন প্রাপ্তি ; দশাননের মৃত্যুর পরে তাহারই ভ্রাতা বিভীষণের লঙ্কার রাজসিংহাসনে আরোহণ। যতই ধর্মীয় সদ্‌ভাবনার মোড়কে ঢাকিয়া এই ঘটনাগুলি আমরা অন্যভাবে প্রমাণের চেষ্টা করি, যুক্তিপ্রবণ মন কি তাহাতে সায় দেয় ?

এই ভারতবর্ষ তপোভূমি, কর্মভূমি, ধর্মক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্র। যুগে যুগে কত মহামানব, ঋষি, তাপস, কর্মযোগী এই ভারতভূমি পবিত্র করিয়াছেন। কত সুফী, দরবেশ, আউল, বাউল, শিল্পী, সাধক এই মাটিতে লীন হইয়াছেন। লীলাময়ীর লীলার শেষ নাই। মেহারের আকাশে তাহার পরে লীলাময়ীর কোন লীলা আমরা দেখিতে পাইব। আসুন, সেজন্য আমরা রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। দেখি শিবানন্দের মৃত্যুর পর নিয়তি কোন দিকে এই পরিবারকে চালনা করে। আমরা নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। লীলাময়ী নিয়তি তাহার অদৃশ্য হাতের সূক্ষ্ম সুতার টানে আমি, আপনি, আমরা সবাই ঘুরি ফিরি। তাই মরমিয়া কবি বলিয়াছেন—মা তুমি যেমনি নাচাও, তেমনি নাচি। আমাদের স্বাধীন সত্তা কোথায়?

রাজা শিবানন্দের পুত্র জটাধর, এই জটাধরের জন্ম এক অলৌকিক কাহিনীতে সমৃদ্ধ। আকস্মিক অপ্রত্যাশিত এক মর্মান্তিক ঘটনায় শিবানন্দের মৃত্যু হয়। শিবানন্দ অভিসম্পাত বহ্নিতে ভস্ম হইয়াছেন এরূপ কিম্বদন্তী। এই কিম্বদন্তী আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। স্বর্ণমৃগ দেখিয়া স্বয়ং রামচন্দ্রেরও মতিভ্রম হইয়াছিল। রাজা শিবানন্দের মনে কিভাবে গুরুদেব সম্পর্কে সংশয়ের বীজ উপ্ত হইল? বিপদের সময় এইভাবেই মানুষ বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হয়। শাপ গ্রস্ত শিবানন্দ নিজরাজ্য মেহারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সংবাদ রাজবাড়ীতে পেঁীছিতেই পাগলিনী প্রায় শিবানন্দজায়া গুরুদেব বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের শরণাপন্ন হন। বাসুদেব তখন শিবপূজায় রত। রাণীর বৈধব্য বেশ এবং অসহায় অবস্থা দেখিয়া বাসুদেব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গেই আরাধ্যদেব মহাদেবের আদেশ পাইলেন। রাণীকে বাসুদেব বলিলেন—'মা নিয়তিকে অতিক্রমের কাহারো সাধ্য নাই। আমি তোমাকে পুত্র বর প্রদান করিতেছি। তোমার গর্ভস্থ সন্তান পুত্র

সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হইবে। শিবের আশীর্বাদে সে জটাসহ জন্মিবে। জটাধর নামে খ্যাত হইবে।' এই কথাগুলি বলিয়াই বাসুদেব মৌন হইলেন।

একদিন বাসুদেব ধ্যানমগ্ন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতেই প্রত্যক্ষ করিলেন, এই জটাধরের রাজত্বকালেই মা মহামায়া ভবতারিণী তাঁহার বংশধরকে দেখা দিবেন। সেই দৈববাণী তাঁহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল।

বিধির অমোঘ বিধানে বাসুদেব পাঞ্চ ভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় পুত্র শম্ভুনাথের পুত্র সর্বানন্দরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সর্বানন্দই বাসুদেব পৌত্র সর্বানন্দ। 'ভবিষ্যতি ভবদ্বংশে'—এই 'ত' ছিল দৈববাণী।

রাজা জটাধরের সভাপণ্ডিত ছিলেন শম্ভুনাথ তনয় আগমাচার্য্য। আগমাচার্য্য সুপন্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ। পৌষ সংক্রান্তির এক পুণ্য দিবসে অমাবস্যায় রাজ বাড়ীতে মায়ের পূজা। রাজা জটাধর সপারিষদ্ আগমাচার্য্যের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। দেখা গেল আগমাচার্য্যের পরিবর্তে সর্বানন্দ ঠাকুর পুত্র শিবনাথের সহিত রাজ সভায় প্রবেশ করিতেছেন। তিনিই আজ মায়ের পূজা করিবেন। ভ্রাতা আগমাচার্য্য কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত। মানসিক ভাবে রাজা জটাধর অতিশয় দুঃখ পাইলেন। এই আর্তি তিনি চাপিয়া রাখিলেন।

সর্বানন্দের বিদ্যা বুদ্ধি সম্পর্কে তখনকার মেহারবাসীর বিরূপ ধারণাই ছিল। সভায় গুঞ্জন উঠিল। পারিষদ্ বর্গের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, ঠাকুর মহাশয়, পূজা করিতে আসিয়াছেন—বলিতে পারেন আজ কোন্ তিথি? সর্বানন্দের উত্তরে রাজা জটাধর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। সপুত্র সর্বানন্দ তিরস্কৃত হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে প্রত্যাগত পুত্র শিবনাথ পিতার অজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। সংবাদ শুনিয়া

বাড়ীর সকলেই হতবাক্। হতবাক্ আগমাচার্য্য। হায় ভগবান্, একি হইল। এই বংশে এরূপ অপণ্ডিতের জন্ম।

সর্বানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন—পণ্ডিত হইতে হইবে। নিরক্ষর থাকিলে চলিবে না। শাস্ত্রজ্ঞ হইতে হইবে। মানুষ যখন একাগ্র হয়, সেই একাগ্রতাই তাহাকে অভীষ্ট সিদ্ধিতে সাহায্য করে।

অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়ার লীলা খেলা অজ্ঞ মানুষ, ত্রিতাপদগ্ধ জীব আমরা কি বুঝিতে পারি? তাঁহার অনুগ্রহে গমনে অপটু পাহাড় টপকায়, বোবা কথা বলে। সুতরাং সুদর্শন যুবক, যাঁর বংশ পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত, তিনি কেন নিষ্ঠা থাকিলে, মা সরস্বতীর কৃপা লাভ করিলে পণ্ডিত হইবেন না। শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ সমস্তই ঈশ্বর কৃপায় সম্ভব।

এখনকার মত তৎকালে লেখার জন্য কাগজের ব্যবহার ছিল না! লিখিতে হইত তালপাতায়। কাজেই প্রথমেই তালপাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। যেই কথা সেই কাজ। সংকল্পের দৃঢ়তা মানুষকে মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করে। তালবৃক্ষে আরোহণ সর্বানন্দের শক্তির বাহিরে কিন্তু আজ তিনি ইচ্ছা শক্তিময়ীর কৃপায় বিদ্যার্জনের অদম্য উৎসাহে সমস্ত কর্মেই দক্ষ। অনায়াসে সর্বানন্দ বৃক্ষে উঠিয়া গেলেন। বৃক্ষাগ্রে উঠিয়া তালপাতা সংগ্রহে হাত বাড়াইলেন। কিন্তু একি—এক বিষধর সর্প। সর্প দংশনের জন্য ফণা উদ্যত করিয়াছে। দেখা মাত্রই তৎক্ষণাৎ সর্বানন্দ দংশনোদ্যত ফণীর জীবন শেষ করিয়া দিলেন। পরে দ্বিখণ্ডিত সর্পকে গাছের নীচে ফেলিয়া দিলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। মহামায়ার পরীক্ষা। সর্বানন্দ প্রথম পরীক্ষাতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ। তালপাতা সংগ্রহ করিতে যাইবেন—এমন সময় দেখিলেন, নীচে দাঁড়াইয়া আছেন জটাধারী এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আদেশে সর্বানন্দ মাটিতে নামিয়া আসিলেন, ভূমিষ্ঠ হইলেন। সত্যই কি সর্বানন্দের ভূমিষ্ঠ হইবার দিন। এই কি ভূমিষ্ঠ হইবার পুণ্যলগ্ন, হবেই বা।

জীব মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পার্থিব জগৎ দেখিতে পায় কিন্তু সর্বানন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া দেখিলেন—মায়াময় জগতের পার্থিব লীলা খেলার সামগ্রী এখানে অনুপস্থিত। নাই গর্ভধারিণীর নিরাপদ আশ্রয় ক্রোড় দেশ, নাই মাতৃস্তন্য। কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহাতে সর্বানন্দ মুগ্ধ, বিমূঢ়। কে ইনি। দর্শনে মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল—মন্ত্র মুগ্ধের মত সন্ন্যাসীর পদ প্রান্তে উপনীত হইয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সর্বানন্দ নিজের পরিচয় এবং রাজসভায় অবমাননার বিস্তৃত বিবরণ শুনাইলেন। বলিলেন আমি বিদ্যার্জন করিয়া পণ্ডিত হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সন্ন্যাসী বলিলেন—তোমার এই বিদ্যা, যাহা অর্জন করিতে চলিয়াছ, তাহা অবিদ্যা স্বরূপ, সেই অবিদ্যারূপিণী বিদ্যার প্রয়োজন নাই। তোমাকে প্রকৃত বিদ্যা, সর্ববিদ্যা, মহামায়ার কৃপা প্রাপ্তির সন্ধান বলিয়া দিব। মহামায়ার কৃপাধন্য মানুষ সর্ববিদ্যার অধিকারী হয়। তাহার নিকট আর অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না।

সন্ন্যাসীর নির্দেশে সর্বানন্দ নিকটবর্তী জলাশয় হইতে স্নান সারিয়া আসিলেন। অবধূত সর্বানন্দকে মন্ত্র দিলেন। সর্বানন্দ দীক্ষিত। মন্ত্র প্রাপ্তির পর সর্বানন্দ অসীম শক্তির অধিকারী হইলেন। সন্ন্যাসী সর্বানন্দকে বলিয়া গেলেন আর একটি মহামন্ত্র—

মেহারে জীনমূলে বিবিধতমযুতে পৌষমাসস্য চান্তে।
শুক্রে রাত্র্যর্দ্ধভাগে ত্রিভুবন জননী চাপ্রকাশা প্রকাশা ॥
ধ্যায়ন্ তাং যোগগম্যাং শবহৃদি প্রবিশন্নুক্ত মন্ত্র প্রজাপাৎ।
সর্বাশা পূর্ণকামা মন ইত বরদা সুপ্রসন্না ভবেৎ সা ॥

সর্বানন্দ ইহা বক্ষে ধারণ করিলেন। সর্বানন্দ এখন শ্রুতিধর। পূর্ণশক্তিতে শক্তিমান্। জন্মান্তরের তপস্যার ফলগুলি এত কাল পাথর চাপা ছিল। আজ যেন যাদুকরের যাদুদণ্ডের মৃদুস্পর্শে তাহা অপসৃত হইল। মূর্ত হইল তপস্যার ফলগুলি এবং ক্রমশঃ সর্বানন্দের দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল।

সর্বানন্দ আনন্দে বিভোর। বাড়ীর দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে পূর্ণানন্দের সঙ্গে দেখা। এই পূর্ণানন্দ পিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্যের একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য। পরিবারের সুখ দুঃখের নিত্য সাথী। আদর্শ ভৃত্য। পূর্ণানন্দকে পাইয়া সর্বানন্দ পূর্ণানন্দকেই প্রথমে সন্ন্যাসী দর্শন, মন্ত্র প্রাপ্তির ঘটনা সমস্তই আদ্যোপান্ত বলিলেন।

পূর্ণানন্দের আনন্দ আর দেখে কে? সে ঊর্ধ্ব বাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মুখে অবিরত 'মা', 'মা'। মা ভবতারিণী মাগো, এই শুভ দিনটির জন্যই আমি অপেক্ষা করিয়া আছি। লীলাময়ী মায়ের উদ্দেশ্যে বারবার প্রণতি জানাইয়া পূর্ণানন্দ বলিলেন—মা, আমাকে আমার প্রভু বাসুদেব ঠাকুরের অভিলাষ পূরণে সামর্থ্য দাও। প্রভুঋণ, প্রভুর নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমাকে শক্তি দাও। সর্বানন্দকে পূর্ণানন্দ পিতামহ বাসুদেব ঠাকুরের প্রদত্ত তাম্র ফলকটি দেখাইলেন। 'আমি এতকাল প্রভুর নির্দেশে ইহা গোপনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আজ সময় উপস্থিত। তোমার জিনিস তুমি গ্রহণ কর'—এই বলিয়া নতজানু পূর্ণানন্দ তাম্রফলকটি সমর্পণ করিলেন। সর্বানন্দ দেখিলেন—সন্ন্যাসী প্রদত্ত মন্ত্র শ্লোক যাহা তিনি হৃৎপদ্মে সযত্নে রক্ষা করিয়া, ধারণ করিয়া আছেন—ইহা তাহাই। পরপর ঘটনা প্রবাহের আবর্তে সর্বানন্দ হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। আমরা বলি—ভয় নাই, সর্বানন্দ, সুচতুর কাণ্ডারী পূর্ণানন্দ তোমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবেই।

মন্ত্রদাতা সন্ন্যাসী অবধূত বলিয়াছিলেন—'আজই সিদ্ধি। আজই মোক্ষ। তোর অজ্ঞানের আবরণ আর নাই'। "সর্বাশা পূর্ণকামা মন ইত বরদা সুপ্রসন্না ভবেৎ সা।"

পূর্ণানন্দ যিনি 'পূর্ণাদা' রূপে সর্বানন্দ জীবন নাট্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তিনি শম্ভুনাথের পরিবারের একজন অনুগত

ভৃত্য। তাহার প্রভুভক্তির অপার মহিমা ভক্ত মাত্রকেই ভক্তিরসে আপ্লুত করিবে। নিজেকে প্রভুর কাজে সম্পূর্ণ ভাবে কঠোর ব্রতে 'আত্মত্যাগে' ব্রতী হইতে এমন দ্বিতীয় চরিত্রটির সন্ধান আমরা খুব বেশী পাইয়াছি কি ? নিষ্ঠা ও সেবায় পূর্ণানন্দ অনন্য। পাঠক অনুধাবন করিবেন—অভীষ্ট সাধনে সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের ভূমিকা। আনন্দের পরিপূর্ণতায় প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগে পূর্ণ পূর্ণানন্দের চরিত্র এবং অখন্ড চিন্ময়ানন্দের আনন্দ সুধায় পরিস্নাত, সর্ববিদ্যা অর্জনের সাধনায়, দশমহাবিদ্যা দর্শনে সিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ। আনন্দময়, হিরন্ময়বপু, এক দিব্য পুরুষ। আজও ভক্ত হৃদয়ে উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা। মাতৃকৃপাধন্য পূর্ণানন্দ এবং মায়ের নিয়ত পুত্র সর্বানন্দ উভয়েই নমস্য।

পূর্ণাদার পরামর্শে আর কাল বিলম্ব না করিয়া সর্বানন্দ সাধনায় ব্রতী হইতে প্রয়াসী হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপদিষ্ট মেহার, পৌষ মাসান্ত, শুক্রবার, রজনীর দ্বিতীয় প্রহর, জীনমূল, শব—এসবের মধ্যে প্রথম চারিটির প্রাপ্তি না হয় সম্ভব কিন্তু জীনমূল কোথায় ? শবই বা কোথায় ? কে জীন তরুর সন্ধান দিবে। কিভাবে শবের সমস্যা মিটিবে। পূর্ণানন্দের আশ্বাস—ঠাকুর চিন্তা করিও না, মহামায়ার কৃপায় যথা সময়ে সমস্তই দেখিতে পাইবে।

তখন সর্বজনমান্য জনৈক সুফি সাধক সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। পূর্ণানন্দ তাহাকে দেখিয়া দৈব প্রেরিত সজ্জন পথ প্রদর্শক বলিয়া মনে করিল। সুফি সাধকের নিকট সংকেত পাইয়া জীন তরুর সন্ধান মিলিল। সর্বানন্দের মনে আর এক সমস্যা—শব কোথায় ? পূর্ণাদা বলিলেন, ঠাকুর, তোমার পূর্ণাদা'ই শব হইবে। আবার দ্বন্দ্ব। অন্তর্দ্বন্দ্ব। অতি বিশ্বস্ত, স্নেহ প্রবণ এই মানুষটি মারিয়া আমি সিদ্ধিলাভ করিব—কখনই সম্ভব নয়। পূর্ণানন্দের কাতর আবেদন, সনির্বন্ধ অনুরোধ সর্বানন্দ আর

উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। জীন তরুমূলে উপনীত পূর্ণানন্দ সর্বানন্দ। স্থান মাহাত্ম্যে উভয়ের অন্তঃকরণ আজ দেবীভাবে পূর্ণ। সম্মুখে শুধু চিন্তা সন্ন্যাসীর বাক্, পিতামহের অশরীরী বাক্—কখন ফলপ্রসূ হইবে? চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়া যাইতেছে। অল্প কয়েকটি কথা বলিয়া পূর্ণানন্দ উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ঠাকুর, কোন বাধা, লোভ, ভয় প্রভৃতি মায়ার খেলায় নিজেকে দুর্বল করিবে না। তুমি জপে নিশ্চল থাকিবে। মাতৃ কৃপায় তোমার মাতৃদর্শন নিশ্চয়ই হইবে। মহামায়ার দর্শন হইলে অবশিষ্ট যা কিছু করণীয় তুমিই করিতে পারিবে। মাতৃ দর্শনে মাতৃ কৃপায় সর্বজ্ঞান, সর্ব বিদ্যা অনায়াসে লাভ হয়। তখন অন্যের উপদেশের প্রয়োজন হয় না।

জীনমূলে শায়িত রুদ্ধশ্বাস পূর্ণানন্দ প্রাণায়ামের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সর্বানন্দ (পূর্ণানন্দের) শবের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইলেন। চলিল সাধনা। চলিল জপ। কিছু অশুভ শক্তি, সাধন পথের অন্তরায় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। সর্বানন্দ অচল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—আজই মহামায়ার দেব বাঞ্ছিত পদ যুগলের দর্শন হইবে। সংকল্পে দৃঢ় থাকিলেই সিদ্ধি না আসিয়া পারে না। গভীর রাত্রিতে বনভূমি আলোকিত করিয়া সর্বানন্দের উপাস্য দেবী মা ভবতারিণী আবির্ভূতা হইলেন। সাধক পূর্ণকাম। অপ্রকাশা মহাদেবীর প্রকাশে স্থাবর, জঙ্গম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ আজ পুলকিত। শিহরিত সর্বানন্দ। সাশ্রুনেত্রে সর্বানন্দ মা'কে, মায়ের অপরূপ রূপকে দেখিতে লাগিলেন।

দেবী ভবানী সর্বানন্দকে বলিলেন—বৎস, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট, তুমি একাগ্র সাধনায় আমাকে দর্শন করিয়াছ। দেব দেবী দর্শন একনিষ্ঠ সাধনার ফল। রাত্রির প্রায় অবসান। আমাকে শিব সান্নিধ্যে এখনই যাইতে হইবে। বর প্রার্থনা কর। তোমার

কাঙ্ক্ষিত বর। দিব্য জ্ঞানলাভে সর্বানন্দ এখন মহাজ্ঞানী। মায়ের নিকট প্রার্থনা করিলেন—মাগো, আমি ভৃত্যের বশীভূত, পূর্ণাদা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা আমার, পূর্ণাদার—সকলেরই প্রার্থিত ধন। বাঞ্ছিত আশীষ। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারিণী মা ভবানীর শ্রীচরণ স্পর্শে পূর্ণানন্দ জীবন পাইলেন। দিব্যজ্ঞানী সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের স্তবে তুষ্ট হইয়া মা ভবানী সর্বানন্দকে স্বকীয় দশ-মহাবিদ্যার রূপ দেখাইলেন। বিস্মিত হতবাক্ পূর্ণানন্দ। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পুলকোদ্‌গম চারুদেহে সর্বানন্দ দর্শন করিলেন, প্রত্যক্ষ করিলেন—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা। এই রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়া সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ কৃতার্থ। ধন্য মেহার বাসী, ধন্য সর্বানন্দের পিতৃকুল, ধন্য দাস রাজ পরিবার।

মহাজনেরা বলেন—মহাযোগী যোগবলে সমুদ্র লঙ্ঘন ও আকাশ বিচরণে সক্ষম হইলেও লৌকিক আচার আচরণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। সমাজবন্ধ জীবের পক্ষে কিছু দায় দায়িত্ব থাকিয়াই যায়। তাই দেখা যায়—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মাতৃ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গৃহে প্রত্যাগমনের বাসনা, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কাতর শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ—আরও কত উপাখ্যানে উপদেশে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ।

আজ মা ভবানীর দর্শনের শুভ মুহূর্তে সর্বানন্দের মনে রাজ পরিবারের কথা, রাজা জটাধরের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়িয়াছিল। তিনি আত্মা, আত্মজ, আত্ম পরিবার, আত্মীয় স্বজন, আশ্রয় দাতা দাসরাজ পরিবারের কল্যাণ কামনা করিলেন। পূর্ণানন্দও প্রার্থনা জানাইলেন—"মা, গুরু কৃপায় আমার মাতৃদর্শন সৌভাগ্য, আমি যেন গুরু বংশের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা রাখিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করিতে পারি। মা বলিলেন 'তথাস্তু'।

পূর্ণানন্দের প্রার্থনায় মা ভবানী রাত্রির শেষ প্রহরে, মেহারকে

পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিলেন। মেহারবাসী দেখিল—সমগ্র মেহার আলোর বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে মা ভবানী কৈলাসে পতি সন্নিধানে ফিরিয়া গেলেন।

লোক চক্ষুর অন্তরালে যে লীলা সংঘটিত হইল—তাহার একমাত্র সাক্ষী আমাদের পূর্ণাদা। সর্বানন্দ অকুতোভয়, মাতৃ দর্শনে সিদ্ধকাম।

অপ্রত্যক্ষ মাতৃলীলা আজ মেহার বাসী প্রত্যক্ষ করিতে চলিল। ইহা মহামায়ার অনন্ত লীলার এক ভগ্নাংশ মাত্র। লীলার কি শেষ আছে।

রাজা জটাধরের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া তিনি দেখিতেছেন—পূর্ণচন্দ্রের আলোকে আলোকিত সকল দিক্। অমন চাঁদের উদয় কি করে সম্ভব? রাজা জটাধর চিন্তা ক্লিষ্ট। অদ্ভূত দর্শনে রাজ্যের অমঙ্গল আশংকা করিয়া তিনি ভীত হইলেন। মেহারবাসী, বিদগ্ধ পণ্ডিত আগমাচার্য্য সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—নিশীথের আলোকোজ্জ্বল রূপটি পূর্ণচন্দ্রের বলিয়া মনে হয় না। চাঁদের আলো হইতে এ আলো শত সহস্র গুণে বেশী।

হায় রে, মানব সন্তান, যাঁহার পদ নখ দ্যুতিতে দ্যুতিমান্ রাকেশ, পূর্ণিমার চাঁদ—সেই মহামায়া স্বয়ং মেহারের জনসাধারণকে কৃপা করিয়া তাঁহার মধুর হাসিতে সমগ্র মেহার রাজ্য জ্যোৎস্না প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধিতে কি ইহার ব্যাখ্যা মিলে!

প্রভাত হইয়াছে। গভীর বনভূমি হইতে সর্বানন্দ গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। সঙ্গে পূর্ণানন্দ। মুখে জয় মা ধ্বনি। মা ভবানীর কি অপূর্ব লীলা। এই রসের বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারিলে জীবের মুক্তি। ত্রিতাপ দগ্ধ জীব মুক্তির আস্বাদ পাইবে।

দেখিলেই মনে হয়—তপঃ সিদ্ধ সর্বানন্দ, সিদ্ধকাম এক মহাপুরুষ। অপূর্ব মুখশ্রী, শান্ত অথচ সমাহিত। সর্বদেহে

অপূর্ব জ্যোতির বিচ্ছুরণ। আগমাচার্য্য স্বগৃহে সর্বানন্দকে দেখিয়াই ভাবিলেন, এ কোন্ সর্বানন্দ! গতকল্য যাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, যাহাকে আমরা এতকাল সংসারের বোঝা স্বরূপ ভাবিতাম—একি সেই সর্বানন্দ! সর্বানন্দের এই অভাবনীয় পরিবর্তন আগমাচার্য্যের তার্কিক মন কোন প্রকারেই মানিয়া নিতে পারিতেছিল না। আগমাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া কৌতূহল পর বশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনিলেন। আগমাচার্য্যের চোখে আনন্দ ধারা বহিতে লাগিল।

সকালের প্রতীক্ষায় ছিলেন রাজা জটাধর। তিনি ছুটিয়া আসিলেন গুরুগৃহে, আগমাচার্য্যের নিকটে। দেখিলেন সর্বানন্দকে। রাজার মুখে 'রা' নাই। এ কি? মাত্র ১দিন পূর্বে যাহাকে দেখিয়াছি—সেই ব্যক্তি, এবং সম্মুখস্থ ব্যক্তি কি এক, অভিন্ন। তাহা কখনই হইতে পারে না। এ যে শান্ত সমাহিত অপূর্ব দেহ-সৌষ্ঠব মণ্ডিত তপঃ প্রভোজ্জ্বল বিরল ব্যক্তিত্ব। মনে হয় স্বর্গ হইতে সদ্য আগত কোন দেবদূত। ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া তাপদগ্ধ মানুষকে অমৃত রস সিঞ্চনে সমস্ত অকল্যাণ হইতে মুক্তি দিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কি দৃষ্টি! দৃষ্টিতে ক্ষমাসুন্দর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজা জটাধর আগমাচার্য্যের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। সর্বানন্দের সিদ্ধির সমগ্র বিবরণ অবগত হইলেন। গতকল্য রাজসভায় যে অসৌজন্য প্রদর্শন করা হইয়াছিল, অনুতাপানলে দগ্ধ রাজা জটাধর সর্বানন্দের নিকট তজ্জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিলেন।

রাজা বলিলেন, ঠাকুর, আমরা অমঙ্গলের আশংকায় আতঙ্কিত। সর্বানন্দ—অমঙ্গল কিসের, আতঙ্কই বা কেন? সবই মহামায়ার লীলা। মা কখনও সন্তানের অমঙ্গল করেন না। আমরা নির্বোধ। আমাদের শরণাগতি নাই। কিছুই বুঝিনা। অথচ বুঝিনা এই

টুকু বুঝিবার বিদ্যাও আমাদের নাই। সর্বদা আমরা অহং বুদ্ধিতে আত্মহারা। মা তাঁহার অবোধ সন্তানকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। শরণাগতের ভয় নাই।

বিচক্ষণ রাজা জটাধর সর্বানন্দের মুখ নিঃসৃত অমৃতময় জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ শুনিয়া এই অজ্ঞান মানুষটিকে (যা একদিন পূর্বেও ছিলেন) একটি দ্যুতিমান, মধ্যাহ্ন গগনের চিরভাস্বর সূর্যের সঙ্গেই তুলনা করিলেন এবং ভক্তি বিনম্রচিত্তে বার বার প্রণাম নিবেদন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সর্বানন্দের যোগ বিভূতির কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল। সমগ্র মেহার রাজ্য, রাজ্যবাসী নিজেদের ভাগ্যশালী মনে করিয়া সর্বানন্দ দর্শনে, শুধু একটু দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য আগমাচার্য্যের গৃহে ভিড় করিতে লাগিল। গ্রামে গঞ্জে লোকের মুখে একই কথা—ঠাকুর সর্বানন্দ আলৌকিক বিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ। তিনি সবই করিতে পারেন। তাঁহার আশীর্বাদে অনেকে রোগমুক্ত হইয়াছেন। সর্বদা স্বভাবে বিভোর, আত্ম নিমগ্ন সাধকটি মাতৃনামে তন্ময় হইয়া নিরাসক্ত ভাবে মহামায়া ভবানীর আরাধনায় ডুবিয়া আছেন। ভাগ্যবলে এই সময় তাঁহার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হইলে সাধকের আশীর্বাদে তিনি সফল মনোরথ হন। রোগী রোগমুক্ত হয়। নিঃসন্তান সন্তান লাভ করে। সংসারে শান্তি ফিরিয়া আসে। মানুষ সর্বানন্দদেবের জয় ধ্বনি দিতে দিতে স্বস্থানে চলিয়া যায়। সেই সময় মেহারের এই দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রাজ জটাধরের মনে শান্তি নাই। মেহার কুলচন্দ্রমা পরম ইষ্ট সর্বানন্দ, শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব মেহার ত্যাগ করিয়াছেন। সর্বানন্দ দেবের মেহার ত্যাগের ঘটনাটিও একটি দুর্ঘটনা বলিয়া রাজার মনে হইল। মনে পড়িল পিতৃদেব শিবানন্দের কথা। মনে পড়িল গুরুদেব বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের অভিশাপের কথা। রাজা দেখিলেন

—তাঁহার অন্তর্ধানের সাথে মেহারের সুখ, শান্তি, আনন্দ, উৎসব, সবই অন্তর্হিত হইয়াছে। পাখীর কূজনেও তাহার প্রতিধ্বনি। গাছে গাছে আগের মত আর ফুল ফোটে না। পিঞ্জরা-বন্ধ শুকশারী আর মধুর মাতৃনাম করে না। শিশুদের খেলাধুলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেহারে এখন আর হাট বসেনা। হাট বসিলেও লোক সমাগম অতিঅল্প। সর্বত্রই যেন এক বিষাদের ছায়া।

প্রত্যূষে পাখীর কলকূজনে রাজা জটাধরের ঘুম ভাঙ্গিত। স্তুতি পাঠকেরা রাজ মহিমা কীর্তন করিয়া রাজাকে ঘুম হইতে উঠাইত। এখন যেন সবই অন্তর্হিত। পাখীর ডাকে আর সেই মাধুর্য্য নাই। স্তুতি পাঠকেরা যেন অর্ধবোবা হইয়া গিয়াছে। আগের মত রাজ সভা আর বসে না। পারিষদ্ বর্গ সভায় উপস্থিত থাকিয়াও মনে হয়—কোন ঐন্দ্রজালিকের অদৃশ্য হস্তের যাদু দণ্ড স্পর্শে তাহারা চুপ হইয়া গিয়াছে। পারিষদ্ বর্গ একে অন্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন তাহারা কাতর। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—মহাত্মা শ্রীমৎ সর্বানন্দের অন্তর্ধান মেহারের জনমানসে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে। মহামায়ার অমৃত বারি সিঞ্চন ব্যতীত এই ব্যাধি নিরাময়ের অন্য পথ কি আছে? আজ ভবরোগের প্রকৃত বৈদ্যকে আমরা হারাইয়াছি—তথাপি যুক্ত করে প্রার্থনা জানাইব।

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নম্।
জ্ঞান স্বরূপং নিজ বোধযুক্তম্॥
যোগীন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈদ্যম্।
শ্রীমদ্ গুরুং নিত্যমহং ভজামি॥

এমন সময় একদিন রাজ সভায় জনৈক দণ্ডী স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিরাচরিত প্রথায় দন্ডীর অভ্যর্থনা হইল। রাজা জটাধর আসনে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন

করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডী রাজাকে বলিলেন। রাজন্, আমি কাশীবাসী একজন দন্ডী স্বামী। আমার গন্তব্যস্থল চন্দ্রনাথ ধাম। আমি তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়াছি।

রাজা জটাধর দণ্ডীকে কাশী পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সবিনয়ে ইহাও বলিলেন—রাজা জটাধর আজ ধন্য। শোকাহত হৃদয়ও আজ গুরু কৃপা অনুভব করিতেছে। ধন্য আমার প্রজাবৃন্দ। আমি আমার নিত্যনৈমিত্তক ক্রিয়ার সাফল্য লাভ করিলাম। কিন্তু হে পণ্ডিত প্রবর, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, অবিমুক্ত বারাণসীধাম ত্যাগ করিয়া কেন অন্যত্র গমনোৎসুক হইয়াছেন? আপনার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ কর্ম ধর্মাচরণ শাস্ত্রালোচনায় কি কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে? আপনার নিত্য কর্ত্তব্য বেদ পাঠ, নিত্য হোম যজ্ঞ, উত্তর বাহিনী গঙ্গায় অবগাহন—প্রভৃতি সৎ কর্মানুষ্ঠানে কি কোন বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছে? অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী। সেখানে পরমশিব, মাতা অন্নপূর্ণা সর্বদা বিরাজমান। কাশী ক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ হইলে অন্তে শিব সাযুজ্য প্রাপ্তির বলবান্ শাস্ত্র নির্দ্দেশ রহিয়াছে। স্থান ত্যাগের হেতু জানিতে আমার বড় ইচ্ছা। অনুগ্রহ করিয়া আমার ইচ্ছা পূরণে আপনার সম্মতি প্রার্থনা করি।

দণ্ডী বলিলেন, বারাণসীতে সম্প্রতি বড় উৎপাত। জাতিতে ব্রাহ্মণ, এক বঙ্গ সন্তান। মদ্য মাংসাসক্ত দুরাচারী। অবধূতের মত সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আচার বিহীন, বেদ বিরুদ্ধ কর্মে রত, মদ্য মাংসাদি ভোজী, অস্পৃশ্যান্ন ভোজন-পটু, যত্র তত্র অবস্থানকারী দেখিয়া কাশীর দণ্ডী সমাজ তাহাকে তাড়া করে। সেই অবধূত স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন মত ও পথের কথা শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ সহকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে নিজের মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—তাঁহার আচরিত পথ ও মত সঠিক। বেদ বিগর্হিত নয়। তিনি দণ্ডী স্বামীদের ইহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন—আপনারা শৈব, বারাণসীর দণ্ডীস্বামী, বিশ্বনাথের সেবক। আপনারা সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম। শাস্ত্রের নির্দেশ আছে—শক্তি ব্যতিরিক্ত শক্তিমানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। শক্তিমান্ অথবা শিব প্রকৃতপক্ষে শক্তিরই উপাধিহীন পরম অবস্থা বিশেষ। বীরাচারী সাধক ধর্ম বিগর্হিত পথে বিচরণ করেন না। আপনারা শান্ত হউন। নিজেদের ইষ্টে অনিষ্টের বীজ বপন করিবেন না। সেই আমরা, সেই বঙ্গসন্তান অবধূতের কোন কথাই সেইদিন শুনি নাই। তিনি পুনরায় আমাদের দ্বারস্থ হইয়া আমাদিগকে, কাশীর দণ্ডীসমাজকে তাঁহার আবাসে আহার্য্য গ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন। অবধূতের মধুর ব্যবহারে শাস্ত্রের প্রতি অগাধ নিষ্ঠায় মুগ্ধ দণ্ডীসমাজ কিছুটা শান্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনান্তে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া নির্ধারিত দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে অবধূতের আবাসে উপস্থিত হইল। শিব! শিব! শিব! একী অনাচার, আমাদের আহার্য্যরূপে পরিবেশিত হইয়াছে, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি আমিষ জাতীয় দ্রব্য। দণ্ডীগণ শাপ শাপান্ত করিতে করিতে সদলে উঠিয়া পড়িল। অবধূতজী অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন। তিনি মন্ত্র মুগ্ধ দন্ডীদের পরদিন নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার্য্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণে রাজী করাইলেন। এই 'ত' মহামায়ার খেলা। ভক্তের মান রক্ষায় তিনি সর্বদা ভক্তের পাশেই অবস্থান করেন।

পরদিন সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার্য্য পরিবেশিত হইল। দণ্ডী সমাজ সাগ্রহে আহার্য্য গ্রহণে ব্যাকুল। কিন্তু প্রবল বাধা দেখা দিল—সমস্ত পরিবেশিত দ্রব্যেই মৎস্য, মাংসাদির গন্ধ। দন্ডীরা পাত্রত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই বিড়ম্বনার পশ্চাতে অবধূতের কূট কৌশল, চক্রান্ত আবিষ্কারেও দণ্ডী সমাজ-প্রধানগণ ইতস্ততঃ করিলেন না।

আমরা সকলেই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলাম। তদবধি

প্রতিদিন আহারের সময় আমাদের আহার্য্যে মৎস্য মাংসাদির গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম। অনাহারে কতদিন থাকা যায়। প্রতিদিনই মনে হয়, অবস্থার পরিবর্তন হইবে কিন্তু 'যথা পূর্বম্'। অনাহারে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত। দণ্ডীরা বারাণসী ত্যাগে মনঃস্থির করিল। বিশ্বনাথকে প্রণাম করিয়া ভোগকাতর দণ্ডীগণ তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে তীর্থান্তরে যাত্রা করিয়াছেন। আমি 'চন্দ্রশেখর' দর্শনাভিলাষী, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া রাজসভায় উপনীত হইলাম।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রাজা জটাধর অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন। কিন্তু গুরুদেবের সন্ধান জানিতে পারিয়া, তাঁহার শারীরিক কুশলের সংবাদ জানিয়া গুরুর উদ্দেশ্যে আভূমি প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। রাজা দণ্ডীকে বলিলেন—হে মহাত্মন্, যিনি অবধূত প্রায় কাশীধামে বিচরণ করিতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব সর্বানন্দদেব। আপনারা তাঁহাকে জানেন না। তাই এরূপ নিন্দা করিতেছেন। তিনি শ্রীদেবী জগন্মাতার, ভবতারিণীর কৃপাধন্য। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি কালিকাদি দশ মহাবিদ্যার দর্শন লাভে কৃতার্থ। মহাদেবী আমার গুরুদেবকে নিয়ত পুত্র রূপে স্বীকার করিয়াছেন। বিচক্ষণ রাজা জটাধর আরও বলিলেন—আপনারা বলিতেছেন বঙ্গজ এক ব্রাহ্মণ অবধূত। শাস্ত্রকার অবধূতের কি লক্ষণ করিয়াছেন। অবধূত কাহাকে বলে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ—

যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥

শ্লোকার্থ ঃ যে পুরুষ আশ্রম চতুষ্টয় ও চতুর্বর্ণের বেড়া জাল ছিন্ন করিয়া আত্মরতিতে সদা মগ্ন, তিনি যোগী, তিনি অতি বর্ণাশ্রমী। চতুরাশ্রম ও বর্ণচতুষ্টয়ের ঊর্ধ্বে তাঁহার স্থান, তিনিই অবধূত পদ বাচ্য। শয়ন ভোজনে বাদ বিচার অবধূতের পক্ষে শাস্ত্র বিগর্হিত আচরণ। তিনি বর্ণ ও আশ্রমের পরিপন্থী আচরণ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু এ কথাও সত্য ও তথ্য নির্ভর নহে।

অবধূত অতিবর্ণাশ্রমী। হায়, আপনাদের বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রে নিষ্ঠা, সদাচারের অতি বাড়া বাড়ি!

রাজা জটাধরের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে দণ্ডী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্—কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ মহাত্মা আপনার গুরুদেব, ভবতারিণীর দর্শন লাভ করিয়াছেন। এখন জানিতে ইচ্ছা করে—তিনি কিভাবে সিদ্ধিলাভ করেন? কি কঠোর তপস্যা তিনি করিয়াছেন? কিভাবে কালী প্রভৃতি জগন্মাতৃগণ তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। এ বিষয়ে আপনিই একমাত্র যথার্থ বলিতে সক্ষম।

"কথং সিদ্ধিঃ কৃতা তেন তপো বা কিং কৃতং মহৎ।
প্রত্যক্ষা বা কথং ভূতাঃ কাল্যাদি জগদম্বিকাঃ॥
তদ্বদস্ব মহারাজ যতস্ত্বং বেৎসি তত্ত্বতঃ॥"
"অপৃচ্ছত্তমসৌ ভূয়ঃ কথং স্যাদাত্মজাত্মজঃ।
কেনৈবোগ্রেণ তপসা প্রত্যক্ষা সা সনাতনী"।

—সর্বানন্দ তরঙ্গিণী

রাজা জটাধর—আমার গুরুদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনে আমি অক্ষম। আপনাদের দুর্দশা দেখিয়া আমি দুঃখ বোধ করিতেছি। সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করিয়া আপনার কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করিব।

আমার গুরুদেব সর্বানন্দ মহাশক্তিশালী বীরাচারী সাধক। সাধক শিরোমণি। পিতামহ বাসুদেব। শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য। রাঢ় দেশের সুপ্রসিদ্ধ পূর্বস্থলীতে ইঁহার বাস ছিল। দৈবাদেশ পাইয়া তিনি মেহারে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। আমার পিতা শিবানন্দ তখন মেহারের রাজ সিংহাসনে আসীন। তাঁহার রাজত্ব কালেই বাসুদেবের মেহারে আগমন। তখন হইতে তিনি মেহারের স্থায়ী বাসিন্দা। বাসুদেবের পুত্র শম্ভুনাথ, সর্বানন্দের পিতৃদেব। সেই দ্বিজোত্তম বাসুদেবই পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই সর্বানন্দ। কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তিনি সিদ্ধি লাভ করেন।

মহাত্মা বাসুদেব উগ্রতপস্যায় নিরত। অন্নজলাদি ত্যাগ করিয়াছেন, দেবী দর্শনই একমাত্র লক্ষ্য। কঠোর তপশ্চর্যায় পরা বিদ্যা সন্তুষ্ট হইলেন। দেবী স্বপ্নে বাসুদেবকে বলিলেন,—তুমি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছ। আমি তুষ্ট। কলিযুগে শক্তি মন্ত্র সিদ্ধির জন্য মাতঙ্গ মুনি অপ্রকাশ্য মহালিঙ্গ ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার উপরিভাগে শবারোহণে মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধি। ঐ স্থান বঙ্গদেশান্তর্গত মেহার নামক স্থানের জীনতরু মূল সন্নিহিত। "সিদ্ধিঃ স্বপৌত্রান্তে"। পৌত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ জীন তরুমূলে অর্ধরাত্রে শবারূঢ় হইয়া মন্ত্র সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ বাসুদেব পূর্ণানন্দকে সবিশেষ বলিয়া শম্ভুনাথের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃদর্শনে সিদ্ধ-কাম হইবার উদগ্রবাসনায় দেহত্যাগ করেন। যাঁহাকে আপনারা কাশীধামে অবধূত প্রায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন তিনি সর্বানন্দ। শব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি জগত্তারিণীর দর্শন লাভ করেন।

সর্বানন্দদেবের সিদ্ধিলাভের পূর্ববর্তী গার্হস্থ্য জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র—পাঠকদের সামনে তুলিয়া ধরিবার লোভ সামলাইতে পারিতেছি না।

সর্বানন্দদেব যথাকালে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার পত্নী ভক্তিমতী পতিপ্রাণা বল্লভাদেবী। শিবনাথ তাঁহাদের একমাত্র পুত্র। ভ্রাতা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমাচার্য্য। আর সংসারে আছে সেই পিতামহ আমলের পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য পূর্ণানন্দ। যিনি সর্বানন্দ লীলায় 'পুণাদা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজানুগ্রহে আগমাচার্য্য পরিবার নিরুপদ্রবে পূজা অর্চনা জপ হোমে দিন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনা সমস্ত জীবনের নিয়মিত ছকটিই বদলাইয়া দিল।

রাজ বাড়ীতে মহামায়ার পূজা। আগমাচার্য্য গৃহে অনুপস্থিত।

কে মায়ের পূজায় ব্রতী হইবেন ? শিবনাথ পূজা করিবার অধিকার এখনও পায় নি। সর্বানন্দকে রাজ বাড়ীতে যাইতে হইবে। সর্বানন্দের 'অপাণ্ডিত' ভাবের কথা সকলেই জানিত। স্বয়ং আগমাচার্য্য পর্যন্ত ভ্রাতার অপাণ্ডিত ভাব দেখিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহামায়ার মায়াময় রঙ্গমঞ্চে সর্বানন্দের আবির্ভাব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কে তাহা রোধ করিবে।

প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছি কখন পণ্ডিত প্রবর আগমাচার্য্য আসিবেন। পারিষদ্বর্গও আগমাচার্য্যের বিলম্বের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ। কিন্তু হঠাৎ সপুত্র সর্বানন্দের রাজদরবারে প্রবেশ সকলকে বিস্মিত করিল। সর্বানন্দের মুখে 'ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে পূজা করিবার জন্য তাহার আগমন'—এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হইলাম। সর্বানন্দ আমার গৃহে কালীপূজা করিতে আসিয়া নিজের মূর্খতার জন্য অপদস্থ হইলেন।

অপমানিত সর্বানন্দ গৃহে ফিরিয়া বিদ্যাভ্যাসের বাসনায় তৎপর হইয়া উঠেন। তালপত্র সংগ্রহে বৃক্ষে আরোহণ, সর্পনিধন, অবধূতের সহিত সাক্ষাৎকার ও অবধূত কর্তৃক সর্বানন্দের প্রশংসা, দীক্ষাদান, মন্ত্রপ্রাপ্ত সর্বানন্দ পূর্ণানন্দ সহ বিজন বনে জিন তরুমূলে শবসাধনা—প্রত্যেকটি ঘটনাই অলৌকিকতায় পূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর।

সর্বানন্দ লীলায় আমরা জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীর দেখা পাই। তিনি অবধূত। ভস্মমাখা দেহ, সহাস্য বদন, শরীর অতি দীর্ঘ, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। পরিধেয় বস্ত্রও কুসুম্ভকুসুমের মত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। তিনি সর্বানন্দকে দীক্ষা দিতে আগ্রহী। সর্বানন্দ ভীত, সন্ত্রস্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, কম্পিত কলেবর। অথচ অবধূতকে অস্বীকার করিবার সাহস নাই। দ্বিধাগ্রস্ত সর্বানন্দকে অবধূত বলিলেন, বৎস শ্রবণ কর—

'অক্ষরত্বাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধূত সংসার বন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থ সিদ্ধত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে ॥'

শ্লোকার্থ ঃ—যিনি পর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া বরেণ্য হইয়াছেন, যিনি সংসার বন্ধন মুক্ত। যিনি 'তত্ত্বমসি' এই মন্ত্রার্থের সিদ্ধি করিয়াছেন অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' এই মহামন্ত্রটি সিদ্ধ। মন্ত্রসিদ্ধ সেই মহাত্মা অবধূত রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। আমি ব্রহ্মজ্ঞ। সন্ন্যাসী। সর্বানন্দের দ্বিধাভাব অন্তর্হিত হইল। শিষ্যানুগ্রহকারী দেব-রূপী দয়ার সাগর সন্ন্যাসীকে প্রকৃত উপদেশক ভাবিয়া সর্বানন্দ প্রণাম করিলেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন। সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন, অবমাননার ইতিবৃত্ত। আমি বিদ্যাভ্যাসে প্রয়াসী। আমি পণ্ডিত হইতে চাই। মূর্খের জীবনে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি জুটিবে? তালপত্র সংগ্রহে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ছিলাম। সর্প নিধন আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন আমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপদেশ দিন। সর্বানন্দকে আরও একাগ্র ও সত্যনিষ্ঠ করিবার জন্য সন্ন্যাসী মন্ত্র শক্তির কি অপূর্ব ক্ষমতা তাহাকে দেখাইলেন—মৃত দ্বিখন্ডিত সর্প মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চনে জীবন পাইল। সর্বানন্দ অবাক্। অবধূত সর্বানন্দকে দীক্ষা প্রদান করিয়া মন্ত্র সিদ্ধির রহস্য বলিয়া গেলেন। চোখের পলকে সন্ন্যাসীর অন্তর্ধান। সর্বানন্দ বিস্মিত ও চমৎকৃত। সর্বানন্দ এখন শ্রুতিধর। সন্ন্যাসী প্রদত্ত মন্ত্র সর্বানন্দ তৎক্ষণাৎ কন্ঠে ধারণ করিলেন। এবং হৃদয়ের অন্তঃপুরে সযত্নে রক্ষা করিলেন।

রাজা দণ্ডীকে বলিলেন—ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা প্রবাহ আরও চমকপ্রদ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রবণ করুন। আমি যথাসাধ্য বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

দীক্ষাপ্রাপ্ত সর্বানন্দ ভৃত্য পূর্ণানন্দের সহিত বিজন বন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর। জীন তরঙ্গ

সন্নিহিত দেশে বৃক্ষমূলে মাতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ যাহা মাতঙ্গ মুনি স্থাপন করিয়াছিলেন—সেই স্থানই সাধনার স্থান। এই স্থানটির পূর্বাভাস জানা ছিল বাসুদেব ভৃত্যের, পূর্ণানন্দের। সেই-ই নিদ্দিষ্ট স্থানটির আবিষ্কার করিল। এ সম্বন্ধে দৈববাণী ছিল ঃ বাসুদেব ভট্টাচার্য্য যখন অন্ন জল ত্যাগ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধির জন্য কামাখ্যায় দেবী আরাধনায় নিরত, 'মা দেখা দাও। মা দেখা দাও'—বলিয়া যখন আকুল আত্ম নিবেদন—দেবীকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছেন—তখন দৈবাদেশ শুনা গেল—বাসুদেব অবহিত হও।

মাতঙ্গ মুনিনা পূর্ব্বং ভবান্যা মন্ত্র সিদ্ধয়ে।
সংস্থাপিতং মহালিঙ্গম্ অপ্রকাশ্যং কলৌ যুগে॥
তস্যোপরি শবারূঢ়াৎ সিদ্ধিং যাস্যতি ভূতলে।
মেহারাখ্যে বঙ্গদেশে জীনমূলে নিশার্দ্ধকে॥

—সর্বানন্দ তরঙ্গিনী

আরম্ভ হইল সাধনা। ভৃত্য পূর্ণানন্দ শব হইলেন। নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় জপ চলিল। নিশীথ কালে দেবীর আবির্ভাব হইল। দেবীর বর্ণনা গুরুদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি—তাহার কিঞ্চিন্মাত্র এখানে বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

চন্দ্র সূর্য্য তুল্য তেজ, আলোকোজ্জ্বল দিব্য মূর্তি। সর্বানন্দ দেবী মূর্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ইষ্টমূর্তির প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিলেন। সর্বানন্দ দেখিলেন দেবীর অনির্বচনীয় রূপ। তিনি বিশালা, তিনি ভক্তবৎসলা, তিনি দয়াময়ী, শান্তিময়ী, ত্রিলোকের মাতৃ স্বরূপা, আনন্দময়ী।

সর্বানন্দ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন—

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্তবং ত্বমেব সর্বঃ পবনস্ত্বমেব।
ত্বমেব সূর্য্যঃ শশলাঞ্ছনস্তবং ত্বমেব সৌরিস্ত্রিদশাস্তবমেব॥

দেবি, তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মা, তুমিই শিব, তুমি পবন, তুমি

সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি যম এবং তুমিই সমস্ত দেবতা। তোমাকে নমস্কার।

মাতঃ— কিংবা রত্ন সহস্রমণ্ডিত গবী লক্ষস্য দানোদ্ভবৈঃ
পুণ্যৈশ্চাপি তথাশ্বমেধ নিবহৈঃ কাশ্যাদিবাসৈরপি।
কিংবা কোটি সহস্র কল্প কলিতৈ র্ধ্যানৈস্তথা যোগতঃ
মাতস্ত্বৎ পদপঙ্কজে যদি মনঃ স্বল্পঞ্চ বিশ্রাম্যতি ॥

হে জননি, তোমার চরণকমলে ক্ষণকালও যাহার মন নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহস্র রত্নালঙ্কার ভূষিত লক্ষ গোদানে, অশ্বমেধ যাগ সম্পাদনে, কাশী প্রভৃতি তীর্থবাসে অনন্তকাল ধ্যান বা যোগ সম্পাদনে যে পুণ্যার্জন হয় তাহাতে প্রয়োজন কি ?

শ্রীদেবী বলিলেন—

বৎস ত্বং বৃণু বাঞ্ছিতং ঝটিতি ভো রাত্রিঃ ক্ষয়ং গচ্ছতি
শ্রীমদ্ভূতপতেঃ প্রধান নগরী শূন্যা বভূবাধুনা।
অদ্যারভ্য মম ত্বমেব নিয়তঃ পুত্রঃ প্রতিজ্ঞা কৃতা
যস্মিন্ যন্মনসি ত্বমেব কুরুষে সম্পাদনীয়ং ময়া ॥

স্তবে তুষ্ঠ দেবী সর্বানন্দকে বলিলেন—বর প্রার্থনা কর। রজনী শেষ হইতে চলিল। মহাদেবের প্রধান নগরী (কাশীধাম) এখন আমার অভাবে শূন্যা। তুমিই আমার একান্ত পুত্র। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, আমি সম্পাদন করিব।

আপনি বিদ্বান্ দণ্ডীস্বামী, শাস্ত্রজ্ঞ, সেই সুললিত স্তবের কথা কি বলিব, স্তোত্রের ভাষা দেবভাষা, অপূর্ব মাধুর্য্যভরা।

সর্বানন্দকে বর দিতে চাহিলে (দেবীকে) সর্বানন্দ বলিলেন, মাতঃ তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন আমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছে। জননি, যদি অন্য বর দিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সম্মুখে যে দাস শব রূপে বিদ্যমান তাহাকে জীবন দান কর। মহামায়ার শ্রী চরণ স্পর্শে সর্বানন্দের অনুগ্রহে যোগ নিদ্রা প্রভাবে বাহ্য জ্ঞানশূন্য শবরূপী পূর্ণানন্দ মুক্তি লাভ করিল। ভবতারিণী

তাহাকে দেবীর পরম রূপদর্শনে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

চৈতন্য প্রাপ্ত পূর্ণানন্দ দেবীরূপ দর্শনে পরমপ্রীতি লাভ করিলেন। দেবীকে মনের আকুতি জানাইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

পূর্ণকাম সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ শ্রীশ্রীভবতারিণীর পাদপদ্মে আরও একটি প্রার্থনা করিলেন। মা, আমাদিগকে তোমার দশবিধ রূপ দেখাও।

রাজা জটাধর বলিলেন, হে দণ্ডীবর, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মহামায়া আমার গুরুদেবকে কালী প্রভৃতি (মায়ের) দশবিধ রূপ দেখাইলেন।

সর্বানন্দ কৃতজ্ঞ চিত্তে দেবীর নানাবিধ স্তব করিয়া বলিলেন, জননি, লীলাময়ি, এই বঙ্গপ্রদেশে মেহারে তোমার জগদম্বা রূপ (দশবিধ রূপ—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা) আমি দর্শন করিলাম।

পূর্ণানন্দ জগদম্বাকে পুনরায় বলিলেন—

মাতস্ত্বন্নিজদাস-দাসতনয়ঃ শূদ্রঃ পুনা যাচতে
সর্বানন্দ কুলস্য ভক্তিরচলা ত্বৎপাদপদ্মে সদা।
মন্ত্রোঽয়ং চিরমস্তু মাস্তু রিপুতা চক্রে জগত্তারিণি
ব্রহ্ম ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলং পশ্যামি যৎ সেবয়া॥

(সর্বানন্দতরঙ্গিণী)

মা, তুমি জগৎ পালন-সংহার-সৃষ্টি কারিণী, তোমার কৃপাপ্রাপ্ত সর্বানন্দ তোমার দাস, আমি দাসের দাস পূর্ণানন্দ। তোমার নিকট প্রার্থনা—সর্বদা তোমার পদযুগলে সর্বানন্দবংশের সন্ততি গণের অচলা ভক্তি থাকুক। যে সর্বানন্দ লব্ধ মন্ত্রের সেবায় তোমার চরণ যুগল দর্শন করিতেছি—সেই সিদ্ধ মন্ত্র সর্বানন্দ বংশধর গণের মূল মন্ত্র হউক এবং চক্রে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে।

হে জননি, অপর একটি প্রার্থনা—তোমার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ নখ

কিরণে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ করিয়া ঘোর তমসাচ্ছন্ন মেহারবাসীর দৃষ্টি উজ্জ্বল দীপ্তিতে আলোকময় করিয়া তোল।

এরূপ স্তবে তুষ্টা ভগবতী—

স্তোত্রে ভগবতী তুষ্টা তাভ্যাং দত্ত্বা বরন্তদা।
নখেন্দুং দর্শয়িত্বা সা গতা শ্রী শিবসন্নিধৌ ॥

ষড়ৈশ্বর্যশালিনী দেবী শঙ্করী সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দকে প্রার্থিত বর প্রদান করিয়া নখ পূর্ণচন্দ্র দেখাইয়া তমসাচ্ছন্ন মেহার পুরী (অমানিশি) আলোকোদ্ভাসিত করিয়া শিব সান্নিধ্যে গমন করিলেন।

বিস্ময় বিমুগ্ধ দণ্ডী রাজার নিকট সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া নিজেকে আরও নিঃসংশয় করিবার জন্য (রাজা জটাধরকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজন্, সর্বানন্দ যে নির্জনে সিদ্ধিলাভ করিলেন—তাহা কিরূপে অবগত হইলেন?

রাজা বলিতে লাগিলেন—আমার পুরবাসী অর্থাৎ মেহারবাসী সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই অমা নিশাতেই নির্মল পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইল। এই আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এই ঘটনাকে মঙ্গলজনক অথবা অমঙ্গলের সূচক—আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এই ঘটনার পরে শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ধারায় নিজেকে অভিষিক্ত করিয়া নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত ভাবে মেহার প্রদেশে বাক্‌শক্তি রহিতের মত সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সর্বানন্দকে দেখিয়া মেহারের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিছু লোক বলিতে আরম্ভ করিল—দেখ, দেখ, চলমান শিব। হাঁটিয়া চলিয়া গেল। যে ভাগ্যবান্ সেইই শুধু আশীর্ব্বাদ পায়। কোন কোন ভক্তজন গুরুদেবের চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া আর ছাড়িতে চায় না। সর্বানন্দ সকলকে মধুর বাক্যে প্রীত করিয়া সত্বর অন্য পথে চলিয়া যায়। কিছু লোকের

বিরূপ সমালোচনা ছিল বটে কিন্তু সর্বানন্দদেবের গায়ে তাহার ছিটে ফোটাও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সর্বানন্দের প্রতি জনগণের বিরূপ মনোভাব মা জগদম্বার মনে অস্বস্তি উৎপাদন করে। তিনি লোক-শিক্ষার্থে মর্তে অবতীর্ণ হইলেন।

দেখিলেন—এক শাঁখারী শাঁখা চাই, শাঁখা চাই বলিয়া জোর হাঁকাইয়া চলিয়াছে। শাঁখারী পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। গ্রীষ্মের দোর্দণ্ড মার্তণ্ড তাপ তাহাকে আরও ক্লান্ত করিয়া তুলিল। সারাদিন ঘুরিয়াও একজোড়া শাঁখাও বিক্রয় করিতে পারে নাই। হঠাৎ শাঁখারী অদূরে একটি সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইল। শাঁখারী ঐ রমণীর দিকে অগ্রসর হইতেই মধুর কণ্ঠে শাঁখারীকে রমণী বলিলেন—বাছা, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। তুমি কি আজ এক জোড়া শাঁখাও বিক্রয় করিতে পার নাই। আমাকে এক জোড়া শাঁখা দাও। একজোড়া ভাল শাঁখা আমাকে পরাইয়া দাও। শাঁখারী যত্ন সহকারে খুব ভাল এক জোড়া শাঁখা রমণীর হাতে পরাইয়া দিল। রমণী শাঁখা জোড়া এদিক ওদিক করিয়া ভালভাবে দেখিলেন। শাঁখারীকে বলিলেন—শাঁখা জোড়া সাদা ধবধবে। খুব সুন্দর হইয়াছে। অবশেষে শাঁখারীকে রমণীটি বলিলেন—বাছা, আমার কাছে পয়সা নাই। ঐ যে সম্মুখে বাড়ীটি দেখিতেছ—ঐ বাড়ীতে গিয়া ছেলেকে বল, 'তোমার মা শাঁখা পরিয়াছেন। দামটা দিয়া দিতে বলিলেন। তাকের উপরে ভাঁড়ে পয়সা আছে, সেই পয়সা দিয়া যেন দামটা মিটাইয়া দেয়।'

রমণী এগিয়ে চলিলেন। সুন্দর ধবধবে শাঁখা জোড়া তখন রমণীর রূপ আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। শাঁখারী অপলক দৃষ্টিতে রমণীকে দেখিতে লাগিল। দর্শনে শাঁখারীর নয়ন যুগল তৃপ্ত হইল। একটু নিমেষ ফেলিতেই শাঁখারী দেখে—রমণীটি কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল।

শাঁখারী কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বাক্স

গুছাইয়া শাঁখার দামের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ীর দিকে চলিল। সর্বানন্দ সেই সময়ে ঘরেই ছিলেন। শাঁখারী—'আপনার মা শাঁখা পরিয়াছেন। আমাকে দাম দিয়ে দিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে তাকের উপরে ভাঁড়ে পয়সা আছে।' সর্বানন্দ বলিলেন, অনেকদিন আগেই আমার মাতৃ বিয়োগ হইয়াছে। আমার 'মা' কিভাবে শাঁখা পরিবেন? তাকের উপর ভাঁড়ের পয়সা গুনিয়া দেখিলেন—শাঁখারীকে দেওয়ার মত পয়সাই তাহাতে রহিয়াছে। সর্বানন্দ শাঁখার দাম মিটাইয়া দিলেন। শাঁখারীকে বলিলেন, চল, দেখি, সেই রমণী, যাঁহাকে আমার মা বলিয়াছ—তিনি যেখানে শাঁখা পরিয়াছেন সেই পুকুর পাড়ে। শাঁখারী আগে আগে চলিল। সর্বানন্দ পিছনে পিছনে। নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়াই সর্বানন্দ 'মা' তুমি কোথায়! এভাবে তিনবার ডাকিতেই মা পুকুরের মধ্য হইতে শাঁখা পরা হাত দু'খানি উঁচু করিয়া দেখাইয়া দিলেন। বিস্ময়ে হতবাক্ অনেকে তাহা দেখিল। সর্বানন্দের প্রতি বিরূপ মনোভাবের লোকগুলি, অবিশ্বাসীরা নিজেদের অজ্ঞানতার কথা ভাবিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। অলৌকিক হইলেও এঘটনা সেদিন মেহারে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ধন্য শাঁখারী। তোমার জীবনে আর শাঁখা বিক্রয় করিতে হইবে না। তোমার জীবন সার্থক। ধন্য, ধন্য মাতৃসাধক সর্বানন্দ।

পূর্ণানন্দের মনে স্বস্তি নাই। পূর্ণানন্দ সর্বানন্দের আশ্রয়ে থাকিয়াও আজ নিরানন্দ চিন্তাগ্রস্ত। একেবারে দিশেহারা। যাকেই দেখিতে পায়, শুধু বলে, ঠাকুরের কথা। সর্বানন্দদেবের কথা। সম্প্রতি আহার বিহার শয়ন কিছুতেই সর্বানন্দের কোন নিয়ম নাই। অবশ্য তিনি যে সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে ইহা পূর্ণানন্দ ভালভাবেই জানিত, তথাপি আগে চলা ফেরায় কথাবার্তায় একটা ছন্দ ছিল। আজকাল তাও দেখা যায় না। পূর্ণানন্দ ছায়ার মত ঠাকুরের নিত্য সঙ্গী কিন্তু তাহার কি সাধ্য সামান্য রজ্জু দিয়া

মত্তহস্তীকে বাঁধিয়া রাখে। সর্বানন্দ মেহারের যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখি, সর্বানন্দের কৃপাদৃষ্টি হইতে তাহারা কখনও বঞ্চিত হয় না। মেহারে এক অভাবনীয় অবস্থা। গৃহস্থ গৃহস্থালীর কাজ ফেলিয়া ঠাকুরের দর্শনে ছুটিতেছে। ব্রাহ্মণগণ অতিনিকটে আসিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইতেছে। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আসিলে অন্যের অন্তরের সমস্তই সর্বানন্দ দেখিতে পান। সর্বানন্দ ব্রাহ্মণদের বলেন—মনের পবিত্রতার জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করুন, কাল সমাগত।

পূর্ণানন্দের মাথায় বাজ পড়িল। ঠাকুর কি বলেন, কাল সমাগত কথার অর্থই বা কি? আমরা একটা ব্যাপারে সম্ভবতঃ সকলেই একমত। সিদ্ধি-রজনীর পুণ্য মুহূর্তগুলি, মহামায়ার দর্শন সর্বানন্দ পূর্ণানন্দের জীবনের স্মরণীয় শুভক্ষণ। উভয়েই মায়ের স্তব স্তুতিতে দেবীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবী সর্বানন্দকে নিয়ত পুত্র রূপে স্বীকৃতি দিলেন কিন্তু পূর্ণানন্দের ভাগ্যে দেবী দর্শন ভিন্ন আর কিছু জুটিয়াছে কি? মহামায়ার নিকট পূর্ণানন্দের প্রার্থনা ছিল, যেই গুরুকৃপায় আমার ভবানী দর্শন হইল—আমি যেন সেই গুরুর প্রতি, গুরুবংশের প্রতি ভক্তিমান হই। দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া পূর্ণানন্দকে আশীর্বাদ দিয়া ছিলেন। সুপ্তোত্থিত জীবের মত জাগরণে সমস্ত ঘটনাই আজ পূর্ণানন্দের মনে পড়িতেছে এই মাত্র, তবে ঠাকুরের মত তিনি কি দিব্য দর্শী? কিন্তু তিনি প্রকৃত বেদে, বেদজ্ঞ, সর্বানন্দ জীবন-বেদের প্রত্যেকটি মণ্ডলে যে তাহার অবাধ গতি ছিল—তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। পূর্ণানন্দ ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হইলেন। কোন সিদ্ধান্তেই আসিতে পারিতেছেন না। কাহার সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সুপণ্ডিত আগমাচার্য্য কি এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করিতে পারিবেন!

পূর্ণানন্দের মনে দারুণ ভয়। যিনি সর্বদা ছায়ার মত সর্বানন্দ কায়াকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তিনিও যেন আজ অপরিচিত। ঠাকুরের চোখের দিকে তাকাইলে ভয়। পূর্ণানন্দ ভাবিলেন—আমার দিন কি ফুরাইয়া গেল। গুরুদেবের কোন সেবাই কি আর আমি করিতে পারিব না।

ইতোমধ্যে একদিন সর্বানন্দ পূর্ণানন্দকে ডাকিয়া আনিলেন। বলিলেন—পূর্ণাদা আমার মেহার লীলা শেষ হইয়াছে। আমি অসীমের পথে যাত্রা করিব। দিনক্ষণ এখনও স্থির হয় নাই বটে তবে আমার এসবের ভাবনা নাই। ঠাকুর নীরব হইলেন।

পূর্ণানন্দের চিন্তা—বুঝি, এতদিনের নিত্য সঙ্গী পূর্ণানন্দ এবার মেহারেই পড়িয়া থাকিবে। ঠাকুরের প্রতি অভিমান হইল। আহা, সমাজবন্ধ জীব, আমরা একটুতেই অধীর হইয়া যাই।

পূর্ণানন্দের মনে আরও নানা কথা উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল—'নদী পার হওয়ার পরে কে মাঝিকে মনে রাখে? নিরাপদ প্রসবের পর পুত্র কোলে ফিরিয়া স্বজন বেষ্টিত কোন্ মা 'দাঁই'র কথা মনে রাখে। আমি কি ঠাকুরের কোন সেবাই করি নাই। আজ ঠাকুর আমাকে ফেলিয়া দিবেন'—দুঃখে এবং ক্ষোভে পূর্ণানন্দের বাক্ রোধ হইয়া আসিল। পূর্ণানন্দ মাথা নিচু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অন্তর্যামী ঠাকুর সর্বানন্দ পূর্ণানন্দের মানসিক অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন। মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, উঠ, দুঃখ কিসের? আমি'ত আছি। মাথা তুলিয়া পূর্ণানন্দ দেখিলেন, ঠাকুর তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। পূর্ণানন্দ সাষ্টাঙ্গ প্রণামে গুরুদেবের সম্বর্ধনা করিল। সর্বানন্দ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমরা কি মনে করিতে পারি—ইহা ভক্ত ও ভগবানের মিলন, অথবা কৃষ্ণ সুদামার অকৃত্রিম প্রেমালিঙ্গন। পূর্ণানন্দকে ঠাকুর বলিলেন,—'তুমি আমার সঙ্গ ছাড়া হইবে—একথা তোমাকে কে বলিল। এ শুভদিন কখনও আসিলে আমি

আগেই তোমাকে বলিয়া দিব।' পূর্ণানন্দ নিশ্চিন্ত। মেহার লীলার অবসান—এই বাণীর অর্থ এখনও পূর্ণানন্দের অজ্ঞাত।

কোন এক শীতের সকালে রাজা জটাধর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ পারিষদ্ ছিলেন। সর্বানন্দদেব এখন আর রাজসভায় বড় বেশী আসেন না। রাজসভা যাঁহাদের জন্য সর্বানন্দ কি সেরূপ পণ্ডিত? যিনি রাজার মনোরঞ্জন করিয়া উপস্থিত সদস্যগণকে বিস্ময় বিমূঢ় করিয়া অপূর্ব ভাষণ দিবেন। তত্ত্ব আলোচনা করিবেন। শুধু আলোচনা—কোন সমাধান সেখানে নাই। ঐ কাজ ভ্রাতা আগমাচার্য্যের। জনসাধারণ পণ্ডিতের বাগ্মিতায় অভিভূত হইবেন। কিন্তু এ ত সর্বানন্দের কাজ নহে। মাতৃনাম সুধা পানে সে আজ নাম মদিরাসক্ত। তাঁহার অবস্থান যত্র তত্র। যত বেশী মায়ের নামে 'পাগল ছেলে' দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি কোলে তুলিয়া নেন।

রাজা দেখিলেন সর্বানন্দ উন্মুক্ত গাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রাজা ভৃত্যদের ডাকিয়া একখানা ভাল শাল আনাইলেন এবং গুরুদেবকে ইহা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। সর্বানন্দ শালখানা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা আর ভোগে লাগিল না। এক দুঃস্থ বারবনিতাকে তিনি শাল খানা দিয়া দিলেন। মনে হইল মাটির ডেলার মত পরিত্যাগ করিলেন। ইহাকেই বলা হয় 'লোষ্ট্রবৎ'।

এই কাণ্ড দেখিয়া কিছু লোকের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কেহ মনে করেন—কি নির্লোভ এই ঠাকুর সর্বানন্দ। জাগতিক কোন পদার্থেই আসক্তি নাই, নিরাসক্ত জীবন যাপন উচ্চ কোটির সাধকের পক্ষেই সম্ভব।

কিছু লোক সর্বানন্দকে জব্দ করিবার ইচ্ছায় অন্য পথ ধরিল। রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া তাহারা রাজাকে বলিল—মহারাজ, আপনার দেওয়া শালটি সর্বানন্দ ঠাকুর এক বারবনিতাকে দিয়া দিয়াছে। আমরা তাহার, সেই স্ত্রীলোকটির গায়ে একটি সুন্দর

শাল দেখিয়া আসিলাম। সভায় মস্ত হৈ চৈ। কেহ বলে—এখনই ঠাকুরকে ধরিয়া নিয়া আসা হউক। কাহারও অভিমত—অত উত্তেজনার কি আছে, ধীরে সুস্থে অনুসন্ধান করিয়া ঘটনাটির সত্যাসত্য নির্ণয় করা উচিৎ।

রাজা জটাধর নির্বাক্। গুরুদেবের আচরণ কি সত্যই সংশয়ের অতীত! তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, ঘটনাটি সত্য। বারবনিতার গায়ে শালখানা অনেকে দেখিয়াছে। সর্বানন্দকে রাজ সভায় ডাকা হইল। সর্বানন্দ উপস্থিত হইলেন। শালের বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুর আমার দেওয়া শালটি কোথায়? সর্বানন্দ উত্তর করিলেন। গৃহেই আছে। তিনি ভাগিনেয় ষড়ানন্দের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ষড়ানন্দকে বলিলেন, যাও'ত বাপু, মামীর কাছ হইতে শালখানি নিয়া আইস। ষড়ানন্দ ছুটিল—মাতুল গৃহে গিয়া মাতুলানীকে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল—'মামী, শীঘ্র, মামার নূতন শালখানি দাও। রাজ দরবারে দেখাইতে হইবে। মামা ওখানে বসিয়া আছেন।' মাতুলানী গৃহে ছিলেন না। তিনি কোন সাংসারিক কাজে নিকটবর্ত্তী কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। ষড়ানন্দের আহ্বান মাতুলানীর কর্ণগোচর হইল না। এদিকে সভায় ষড়ানন্দের উপস্থিতিতে বিলম্ব দেখিয়া সভাস্থ জনগণ প্রমাদ গণিলেন। রাজার মনে সর্বানন্দ সম্পর্কে নানা চিন্তা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে। রাজা জটাধর বিষন্ন, বিরক্তও। সর্বানন্দ নিরুদ্বিগ্ন ধ্যানস্থ। রাজসভায় স্থাণুবৎ অবস্থান করিতেছেন।

মা আনন্দময়ী ভবানীর আসন টলিল। ভক্তের, প্রিয় পুত্রের দুর্দিনে তিনি কি মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। সর্বানন্দ ঠাকুরের গৃহে উপনীত হইলেন। ষড়ানন্দের কাতর আহ্বান তখনও চলিতেছে। মা, দয়াময়ী ভক্তানুগ্রহকারিণী। তিনি সর্বানন্দের অব-

মাননার কথা চিন্তাও করিতে পারেন না। হঠাৎ দরজার উপর দিয়া একখানি শাল নীচে পড়িয়া গেল। ষড়ানন্দ দেখিলেন—শালটি যেই হাত হইতে ভূমিতে পড়িয়াছে—সেই হাতের রং গৌর। এ হাত মামীর নহে। নিশ্চয়ই করুণাময়ী মা ভবানীর। তিনি আভূমি আনত হইয়া মহামায়ার উদ্দেশে প্রণতি জানাইলেন।

ষড়ানন্দ উবাচ—

ত্বমীশ্বরী পূর্ণশশাঙ্করূপা মেহার দেশে কিল সংপ্রতিষ্ঠা।
রাজ্ঞঃ সুভাগ্যাতিশয় প্রকাশা ধন্যাঃ সমস্তাঃ পুরবাসি-
লোকাঃ ॥

(সর্বানন্দতরঙ্গিণী)

ষড়ানন্দ বলিলেন—তুমি পূর্ণচন্দ্র স্বরূপা ঈশ্বরী। এই মেহার প্রদেশে তুমি প্রতিষ্ঠিতা। ইহাতে রাজার বড় সৌভাগ্য প্রকাশ পাইতেছে এবং মেহারবাসীগণ কৃতার্থ হইয়াছে।

ষড়ানন্দকে গাত্র বস্ত্র শালটি হাতে করিয়া সভায় সত্বর ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। রাজা জটাধর দেখিলেন তাঁহার দেওয়া শালটি এবং এই শালটি একই। কাজেই শাল হস্তা-ন্তরের অমূলক কাহিনী রাজাকে বিশেষ ভাবে বিব্রত করিল। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর সর্বানন্দ সকলকেই স্নিগ্ধ, প্রীতি ও স্নেহ দৃষ্টিতে আশ্বস্ত করিয়া রাজসভা ত্যাগ করিলেন।

ধন্য সর্বানন্দ, তুমি ক্ষমা তিতিক্ষার এক প্রতিমূর্তি। যতদিন মানুষ জীবিত থাকিবে, যতদিন গঙ্গা ধরাধামে প্রবাহিত থাকিবে, যতকাল হিমালয় পৃথিবীতে স্বমহিমায় বিরাজ করিবে ততদিন তোমার কীর্তিগাথা ঘোষিত হইবে।

এক বহুল প্রচলিত প্রবাদ—'সিন্দুরে মেঘ দেখিলে ঘর পোড়া গরু ভয় পায়'। আজ রাজা জটাধর আতঙ্কিত। মনে পড়িয়া গেল—পিতার আমলে গুরুদেব বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের যাথার্থ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট রাজা শিবানন্দের

মর্মান্তিক পরিণতি। আজ আবার কি বিপত্তি দেখা দিবে কে জানে।

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—অবজ্ঞা, অপভাষণ, অপবাদ—এই তিনটি দোষ মানুষকে বিপন্ন করে। ইহাদের যে কোন একটিই গুরুতর রূপে মানুষকে বিপর্যস্ত করিতে পারে কিন্তু যেখানে তিনেরই সমাবেশ, অর্থাৎ ত্রিদোষে দুষ্ট ব্যক্তির ভাগ্যাকাশ হইতে সৌভাগ্য সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইল—ইহা অভ্রান্ত সত্য। সুতরাং মহতের অবমাননা কখনও কল্যাণপ্রদ নহে, ধর্মসংগতও নহে।

এই দুঃখাবহ পরিস্থিতিতে রাজা জটাধর একান্তে অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা তাঁহার বিশ্রাম কক্ষে অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট অমাত্যসহ এ সমস্যার নানা দিক্ আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় একজন বিদগ্ধ অমাত্য রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, এসময়ে সুফী সাধক রাশ্‌তি শাহ সাহেবের দর্শন পাইলে তাঁহার সদুপদেশ ও সদ্‌বাণী আপনাকে অনেকটা শান্তি দিতে পারে, আপনার এ অস্বস্তিভাব অনেকটা কাটিয়া যাইবে।

রাজা জটাধর সুফী সাধক সম্পর্কে পূর্বেও অবহিত ছিলেন কিন্তু কখনও সেই সাধকের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। সুফী সাধক সম্বন্ধে সর্ব শেষ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজাকে জানাইবার জন্য প্রধান অমাত্য একজন বুদ্ধিমান্ ভক্তিমান্ অমাত্যকে নির্দ্দেশ দিলেন। ইহাও বলিয়া দিলেন, যদি কোথাও সুফী সাহেবের সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইবেন।

পাঠকদের অবগতির জন্য সুফী সাধক রাশ্‌তি সাহেব সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশিত হইতেছে। সর্বানন্দ লীলায় আমরা যে কয়জন মহাপ্রাণের সাক্ষাৎ পাই, তন্মধ্যে সুফী সাধক রাশ্‌তি শাহ অন্যতম। সাধকের আচার আচরণ, শিষ্ট ব্যবহার, ঈশ্বর প্রীতি

অসাধারণ। সাধারণভাবে অন্যান্য গৃহীর মত এই সাধক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন না। নিত্য নিয়ত তদ্গত চিত্ত হইয়া সেই এক ও অনাদি বিশ্বস্রষ্টার সাধন ভজনে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। পরোপকার, দুঃস্থের জন্য মঙ্গল-কামনা, সকলের প্রতি সম ব্যবহার ছিল সুফী সাহেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

প্রসিদ্ধি আছে যখন দিল্লীতে সুলতান ফিরোজশাহের শাসন কাল, সেই সময়ে রাশ্তি সাহেব ভারতবর্ষে আসেন। তিনি আরবের লোক। ধর্মপ্রাণ, সজ্জন। কালক্রমে তিনি একদিন মেহার রাজ্যে আগমন করেন। তৎকালে মেহারের দাস রাজবংশের রাজত্ব। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের লীলাস্থল মেহার তখন সমৃদ্ধ একটি জনপদ।

সুফী সাধক রাশ্তি সাহেব স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মেহারে স্থায়ীভাবে অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দাস রাজবংশের শাহাপুর শাখার জগৎ নারায়ণ তাঁহাকে শ্রীপুর গ্রামে কিছু নিষ্কর ভূখণ্ড দান করেন। এভাবে রাজপরিবারের সঙ্গে সুফী সাহেবের হৃদ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

মেহার অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট রাশ্তি সাহেব ছিলেন, ধর্মোপদেষ্টা, বিপদের বন্ধু, সম্পদের সাথী। এই দরবেশের আধ্যাত্মিকতার মহিমা ধীরে ধীরে সর্বত্র প্রচারিত হইল। দলে দলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আর্তজন ছুটিয়া আসিতে লাগিল সাধকের কাছে। সুফী সাহেব সকলকে দর্শন দিতেন। প্রয়োজনে উপদেশ দিতেন। সকলকে বলিতেন—'তোমরা সকলেই পরম পিতার সন্তান। সকলের জন্য আমি প্রার্থনা জানাই—তোমাদের মঙ্গল হউক, অন্তর হইতে মলিনতা দূর কর, শান্ত শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত হও। প্রতিবেশীর সম্পদে বিপদে নিজে অংশীদার হও।'

সুফী সাহেবের অমৃতময় উপদেশ মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে শুনিত এবং বেদনার্ত মানুষগণ অন্তরে শান্তি পাইত। সকলে দরবেশ সাহেবের নিকট 'দোয়া' ভিক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত।

মেহার অঞ্চলের অনেক ঘটনার দ্রষ্টা ছিলেন এই মহাপ্রাণ রাশ্তি সাহেব। শোনা যায় শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব যখন সাধনার জন্য গভীর অরণ্যে, সাধনার নির্দিষ্ট স্থানটির অনুসন্ধানে ব্যগ্র তখন পূর্ণানন্দের সঙ্গে রাশ্তি সাহেবের অকস্মাৎ সাক্ষাৎকার ঘটে। এই আত্মভোলা সুফী সাহেবকে দেখিয়া 'দৈবপ্রেরিত কোন মহামানব' মনে করিয়া পূর্ণানন্দ দরবেশ সাহেবকে জীন তরুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরহিতে ব্রতী, ঈশ্বর প্রেমী সাধক তখনই জীন তরুর সন্ধান বলিয়া দিলেন।

চিরকুমার রাশ্তি সাহেব মেহার অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট চলমান 'শান্তির দূত' বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন। মেহারের শ্রীপুর গ্রামের একটি বৃহৎদীঘির দক্ষিণ পাড়ে দরবেশ রাশ্তি শাহের সমাধি (দরগাহ) এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগাহ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট সমানভাবে সমাদৃত। আজও হাজার হাজার দর্শনার্থী আনত মস্তকে 'দরগাহ' দর্শন ও আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করে।

সুফী সাধক রাশ্তি শাহ অলৌকিক প্রভাবে বলীয়ান্ এক ব্যক্তিত্ব। যদিও তিনি নিজেকে সর্বদাই গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, তথাপি কখন কখনও তিনি প্রকাশ হইয়া পড়িতেন। শুধুমাত্র একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের ইতি টানিব।

একমাত্র পরমেশ্বরের সাধনায়, তাঁহার অনুকম্পার আশায় দরবেশ সাহেব দিবারাত্রি সেই মেহারের বনভূমিতে অবাধে বিচরণ করিতেন। প্রতিটি তরু, লতা, পশু পাখী, সবই যেন তাঁহার

আপন জন। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টজীবের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেন। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সকলকে স্নিগ্ধ করিতেন। সাধক সর্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে সুফী সাধক রাশুতি সাহেবের সহায়তা কত ফলপ্রসূ। জীবপ্রেমী, বৃক্ষপ্রেমী সুফী সাহেবের জানা ছিল বলিয়াই 'জীনতরুর' সন্ধানটি অতি অল্পায়াসেই পূর্ণানন্দ সুফী সাহেবের নিকট (প্রকৃত সন্ধান) জানিয়াছিলেন। যথা সময়ে অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান, সর্বানন্দদেবের সিদ্ধিলাভে সহায়ক হইয়াছিল। ধন্য সুফী সাধক, তুমিই আর এক সাধকের সাধন পথের মরমিয়া পথ প্রদর্শক, পরম বান্ধব।

তৎকালে বহু সন্ধান করিয়াও রাশুতিসাহেবের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। রাজা জটাধর আবার দৈনন্দিন কাজে আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

সভাতে উপবিষ্ট রাজা দেখিলেন—দন্ডী স্বামী কিছু বলিবার জন্য আগ্রহী। নানা ঘটনার আবর্তে রাজা জটাধর বিব্রত, তথাপি দণ্ডীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি বদ্ধ পরিকর। গুরুর প্রতি কোন প্রকার বিরূপ মনোভাব যাহাতে দণ্ডীর মনে স্থান না পায়, সেজন্য তাঁহার এ প্রচেষ্টা। দণ্ডী বলিলেন—মহারাজ, আপনার নিকট হইতে সর্বানন্দদেবের বহু বিচিত্র অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিলাম। এখন জানিতে ইচ্ছা করে—বেদনিন্দিত মদ্য কি ভাবে পণ্ডিত ব্যক্তি পান করেন।

রাজা জটাধর এ বিষয়ে নিজের কোন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া তন্ত্রের নির্দেশ যাহা তাহাই দণ্ডীকে বলিতে লাগিলেন—দণ্ডী, মহাশয়, শ্রবণ করুন। অকারণ মদ্য পানকে সুরা পান বলা হয়। শাস্ত্র তাহাকে, সেই সুরাপায়ীকে মহাপাতকী মদ্যপায়ী রূপে নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু সেই মদ্য যদি দেবতাকে নিবেদন করিয়া শোধনের পর ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির জন্য পান করা হয়, সেই পান 'কারণ' পান বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ রহিয়াছে। তদতিরিক্ত স্থলে মদ্য পান

বিষভক্ষণতুল্য। এভাবে বহু কথা জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে শ্রীশিব বলিয়াছেন। দণ্ডী ভাবাচার সম্পর্কেও জানিতে চাহিয়া রাজাকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেন। রাজা তন্ত্রোক্ত বহুবচন প্রমাণ দ্বারা দণ্ডীর সংশয় নিরসনে যত্নবান হইলেন।

রাজা বলিলেন—পশ্বাচার, বীরাচার—প্রত্যেক আচার ত্রিবিধ। ইহাদের বিস্তৃত লক্ষণ তন্ত্রাগমে উক্ত হইয়াছে।

তন্ত্রের নির্দেশ—'দর্পণে' প্রতিবিম্বিত পদার্থ যেমন, তদ্রূপ অন্য দেবতার রূপ। সুতরাং অন্য দেবতাকে নিজের ইষ্ট দেবতারূপে ভাবিয়া ক্রিয়া করিবে।

"একদেবং বিনা দেবি, নাস্তি দেবো মহীতলে
এক সূর্যং বিনা সূর্যো নাস্তীহ জগতি যথা ॥
বহু পাত্রে স্থিতে তোয়ে বহু সূর্যং যথা প্রিয়ে।
বহু ভাবে তথা দেবো বহুরূপেণ দৃশ্যতে" ॥

হে দেবি, পৃথিবীতে এক দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। জগতে একই সূর্য, অন্য সূর্যের অস্তিত্ব দেখা যায় কি? হে দেবি, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সংরক্ষিত জলে যেমন শত শত সূর্য প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ বহুরূপে বহুভাবে দেবতাগণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। অর্থাৎ অন্য দেবতাকেও নিজের ইষ্টদেবতার রূপ বলিয়া জানিবে।

দণ্ডীকে রাজা বলিলেন—বীরতন্ত্রে শাক্তগণের পঞ্চতত্ত্ব বলিতে মদ্য. মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই ৫টিকে নির্দেশ করে।

এই পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প ও তন্ত্রশাস্ত্রে রহিয়াছে। যেমন মদ্যের অনুকল্প—কাঁসার পাত্রে নারিকেল জল, দধিতে গুড়, গুড় যুক্ত আদা এবং পায়স। ইহা চতুর্বর্গের ফল দান করে।

বীরাচারী সাধক মদ্য পান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে কিন্তু মদ্যের অভাব দেখা দিলে দুগ্ধ পান কর্তব্য।

মাংসের অনুকল্প—লবণযুক্ত আদা, পিন্যাক, তিল, গম, মাস-

কলাই এবং রসুন। মৎস্যের অনুকল্প—দগ্ধ দ্রব্য। মুদ্রার অনুকল্প—ভাজা চানা।

পঞ্চম তত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া তন্ত্র বলিয়াছেন—যেখানে ইহার অভাব হইবে—সেখানে অনুকল্প রূপে অপরাজিতাকে যোনী রূপে কলপনা করিয়া শিবলিঙ্গকে পুষ্প মধ্যে স্থাপন করিলেই শক্তির অভাবেও মৈথুন উৎপাদিত হইল বুঝিতে হইবে।

এই ভাবে বহু তন্ত্রাগমের প্রমাণ [বীরাচার ও অন্যান্য আচার সম্পর্কে] লিপিবদ্ধ আছে।

তন্ত্র আরও বলিয়াছে—

সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবোত্তমঃ।
বৈষ্ণবাদুত্তমঃ শৈবঃ শৈবাচ্চ শাক্ত উত্তমঃ॥

হে দেবি, সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বেদ উত্তম। সেই বেদ হইতে উত্তম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব হইতে উত্তম শৈব। শৈব হইতে উত্তম শাক্ত।

অতএব হি শাক্তানাং সুরাপানং প্রশস্তকম্।
কথং নিন্দসি ভো দণ্ডিন্ বিচার্য্য শরণং ব্রজ॥

—সুতরাং শাক্তগণের সুরাপান প্রশস্ত। তন্ত্র এরূপ নির্দেশই দিয়াছেন। হে দণ্ডী, কেন আমার গুরুদেবের নিন্দা করিতেছ। এখন আত্ম সমীক্ষা করিয়া গুরুদেবের শরণাপন্ন হও।

রাজা জটাধরের যুক্তি পূর্ণ-শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণে সর্বানন্দ সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর জানিয়া দণ্ডী সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিলেন।

রাজা জটাধর শিষ্টাচার বশতঃ দণ্ডীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া গুরুদেবের সন্ধান দেওয়ার জন্য তাঁহাকে পুনরায় অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিলেন। প্রত্যুত্তরে দণ্ডীবর রাজাকে বলিলেন—রাজন্ আপনি ধন্য, আপনার বংশধর এবং মেহারবাসী কৃতার্থ। আপনারা এমন একজন মহাত্মার চাক্ষুষ দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। আমরাও অবধূতজীকে বারাণসীতে দেখিয়াছি। কিন্তু

আমাদের দৃষ্টি ছিল অস্বচ্ছ। আমরা বিদ্বেষের বশে ইস্ট পথ ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। আজ আমি আমাদের ভুল বুঝিয়াছি। আমার সংশয় কাটিয়া গিয়াছে। মহাত্মা শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বারাণসীর দণ্ডী সমাজ একদা যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এবং আমার কৃত পাপ ক্ষালনের জন্য আমি একটি স্তোত্র রচনা করিয়াছি। আমার ইচ্ছা আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা শ্রবণ করুন। রাজা জটাধর পরম আগ্রহভরে শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দণ্ডীবর বলিতে লাগিলেন ঃ—(স্তোত্রটির বাংলা রূপ দেওয়া হইল)

আমি পরমানন্দ স্বরূপ, শুদ্ধ বুদ্ধ ভাব যুক্ত বিশ্ব পূজ্য গুরুদেব সর্ব বিদ্যাকে প্রণাম করি। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের শরচ্চন্দ্রনিভ মুখ মণ্ডল, কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ। পদ্ম পলাশ লোচন। মহা শঙ্খ মালা গলদেশে শোভা বর্ধন করিতেছে। ভবতারিণীর বরপুত্র তিনি, সর্বদাই শক্তি সমন্বিত হইয়া আছেন। নিখিল যতি সমাজ তাঁহার বন্দনায় রত। মহাদেব তুল্য সেই সর্ববিদ্যাকে প্রণাম।

জ্ঞানাভিমানী যতিগণের অজ্ঞান মানস-গ্রন্থি যাঁহার কৃপায় ছিন্ন হইয়াছিল, যাঁহাকে দর্শন করিলে নেত্র যুগল পবিত্র হয়, সর্বজন বন্দিত সেই সর্ববিদ্যাকে বন্দনা করি।

যাঁহার মুখপদ্ম বিনির্গত স্তবে তুষ্ট হইয়া ভবানী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীমৎ সর্বানন্দ সর্ববিদ্যাকে প্রণাম। আমি আজ বাহুযুগল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বার বার বলিতেছি, কলিতে মুক্তি পথ প্রদর্শনে তুমিই একমাত্র আশ্রয়! হে দেব, তুমিই এক মাত্র অবলম্বন, তুমিই অবতার কল্প মহামানব। তোমাকে যাহারা ভজনা করিবে—তাহারাই ভাগ্যশালী, তাহারা স্বকর্ম ফলেই স্বর্গলাভ করিবে। আমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ তোমাকে জানি নাই, তোমার তত্ত্ব অবগত ছিলাম না। আমাকে ভক্তি যুক্ত কর।

ভূমণ্ডলে কে না জানে প্রতিষ্ঠা গরিষ্ঠা। তুমি অনায়াসে তোমার মৃত দাসকে (পূর্ণানন্দ) পুনর্জীবিত করিয়াছ। তুমিই ঘনান্ধকার রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটাইয়াছ।

তুমি ভিন্ন এ শক্তি আর কাহার আছে? ইহা কোন যুগে ঘটে নাই। আর ঘটিবে ও না।

অবশেষে স্তোত্রের পরিসমাপ্তিতে আছে—এই 'সর্ববিদ্যাষ্টক স্তোত্র' যিনি শুদ্ধচিত্তে প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর ভক্তি সহকারে পাঠ করিবেন সর্বদর্শী, গুরু শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইবেন।

দণ্ডীবরের মুখনিঃসৃত স্তোত্র শ্রবণ করিয়া রাজা জটাধর পুনরায় গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

'সংস্কৃতে' রচিত এই স্তোত্রটি দণ্ডাষ্টক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সেনহাটী

ঠাকুর সর্বানন্দ ছুটিয়া চলিয়াছেন, অসীমের পথে, পরা মায়ের সন্ধানে। মুখে শুধু 'মা' 'মা' ধ্বনি, ঘন ঘন করতালি। মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশে নৃত্য। উদ্দাম নৃত্য নহে। ছন্দ ও তাললয় যুক্ত নৃত্য। ভাবুক ভিন্ন অন্যের অনুভব করিবার শক্তি নাই। কিন্তু সাথী, চিরসাথী পূর্ণানন্দ ভীত। ষড়ানন্দকে বলিলেন—ভাগিনেয়, ভাব ভাল বুঝিতেছি না। এ আবার কোন লীলা আরম্ভ হইল। আমরা ভক্ত পাঠকদের আরও একদিনের কথা মনে করিয়া দিতে চাই—নিশ্চয় আমাদের মনে পড়িবে—সেই লীলার কথা। যেদিন ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ভক্ত সমভিব্যাহারে শত সহস্র মৃদঙ্গমুখর শোভা যাত্রায়, নৃত্য করিতে করিতে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, মনে পড়ে কি মুখে 'রা' 'রা' করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়ান এক মহাপ্রাণের কথা। যাঁহার সুরধনী দর্শনে যমুনা, বৃক্ষদর্শনে কদম্ব বৃক্ষ, পথঘাট জনপদ দেখিয়া ব্রজধাম, রাধা কুণ্ড, শ্যামকুণ্ড সমস্তই মানস পটে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রেমিক, প্রেমের ঠাকুরের কথা, যিনি তারক ব্রহ্ম নামে ভক্তির বন্যা বহাইয়া ছিলেন!

পূর্ণানন্দ সর্বানন্দের ভাবাবেশ দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। ঠাকুরকে সাধনার উচ্চস্তর হইতে সম ভূমিতে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ বিদ্যা পূর্ণানন্দের জানা ছিল। কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, গৌরাঙ্গ লীলার কোন শুভ মুহূর্তের কথা কি আমাদের শুনাইবেন। সর্বানন্দ হাসিয়া উঠিলেন। এত উচ্চহাসি, পূর্ণানন্দ কখনও শোনে নাই। তাহার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন, দেখ পূর্ণাদা, এককে অপরের মধ্যে খোঁজতে যাইও না। একভিন্ন দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব নাই। সমস্ত লীলাই এক, দর্শকের চেতনায় শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাবে

ভাসমান। নাম ভেদে কি প্রকৃত পদার্থের ভেদ হয়? নাম মাহাত্ম্য—সেটা এক এবং অভিন্ন। নামের বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইবে—এতে আশ্চর্যের কি আছে? বিশ্ব চরাচর এই নামকেই আশ্রয় করিয়া চলিতেছে। গ্রহ নক্ষত্র, রবি, শশী—সবই 'ত' নামেরই অধীন। নাম ও নামীর অভেদ ভক্ত মাত্রই জানে। আর মাতৃনামে জগৎ শুদ্ধ, পবিত্র হইবে। উচ্চৈঃ স্বরে নাম কর। নামের মহিমায় চতুর্দ্দিক আলোড়িত হইবে। দূর হইবে অন্ধকার। ঠাকুর মৌন। নীরবতা ভাঙ্গিয়া ষড়ানন্দ পূর্ণানন্দকে বলিল, আর পথ চলিতে পারিতেছিনা, মামা, একটু বিশ্রাম নিলে কেমন হয়। পূর্ণানন্দ বলিল—ঠাকুরকে বলিয়া দেখি—যাত্রা বিরতিতে তিনি রাজী আছেন কিনা?

পূর্ণানন্দের আবেদনে ঠাকুর সঙ্গীদের পথ শ্রান্তি অপনোদনের জন্য কিছু কাল বিশ্রাম করিবার উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতে (পূর্ণানন্দকে) আদেশ করিলেন।

পূর্ণানন্দ দেখিলেন, অদূরে একটি গ্রাম। গ্রামটি সমৃদ্ধ বলিয়াই মনে হইল। বহু প্রাচীন দেবালয়, শাস্ত্র পাঠে নিরত বিদ্যার্থী ও বিদ্বজ্জনের আনন্দ মুখর ধ্বনিতে গ্রামটি যেন গমগম করিতেছে। পাশে বহিয়া চলিয়াছে একটি নদী। পূর্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল—গ্রামটির নাম সেনহট্ট, সেনহাটী। এই সেনহট্ট গ্রামটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত।

ঠাকুরকে বলিলেন—ভৈরবের তীরে এই গ্রামে বিশ্রাম নিতে পারিলে ভালই হয়। কি বিপদ্। ঠাকুরের ভাবান্তর হইল। মুখে কথা নাই। চোখে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। ষড়ানন্দ-'ত' পূর্ণানন্দের উপর চটে আগুন। মাতুল, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। সেনহট্টের পরিচয়ে এত বলার কি ছিল। ভৈরব নদের তীর আরও কত কি? এখন ঠাকুরের কি অবস্থা! আমি জানি না। সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমার।

পূর্ণানন্দ বলিল—ভাগিনেয়, আজ দীর্ঘকাল যাবৎ তোমার

মাতুল বংশের দায় দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছি। বাসুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আমলের লোক আমি। দেখিয়াছি, ঠাকুর বাসুদেবকে, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যকে, তোমার মাতুল সর্বানন্দের কথা আর কি বলিব। তোমরা সবই জান। আমাকে ভয় দেখাইও না। ঠাকুরকে আমি আমাদের মধ্যেই ফিরাইয়া নিয়া আসিতেছি। তুমি শুধু মায়ের নাম জপ কর।

আত্মস্থ ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। সর্বানন্দ বলিলেন, পূর্ণাদা, আমার মনে পড়িল, মা ভবানীর কথা। তুমিও জান। মা বলিয়াছিলেন, বাছা, সত্বর বর প্রার্থনা কর। আমাকে রাত্রি মধ্যে ভৈরব সন্নিধানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই কি সেই ভূতপতি, বিশালাকার ভৈরব। না শুধুমাত্র শুদ্ধ পবিত্র জলাধার। ভৈরবের জল 'ত' জল নয়, এ মায়ের বক্ষঃনিঃসৃত অমৃত ধারা। বাবা ভৈরব, নদ ভৈরব—আজ আমার সমান। নিশ্চয় সন্নিহিত কোন স্থানে ভবানীর আবাস আছে। ভব-ভবানীর যুগল মূর্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে চাই।

পূর্ণানন্দ ভাবিল, এ যে-আর এক বিপদ। নদী দেখিলেই যমুনা, বৃক্ষ দেখিলেই কদম্ব, ধ্বনি মাত্রই বংশী ধ্বনি কানাই'র। এ যে আর এক সাধকের ভাব। 'ভৈরব নদ' এই নাম যে মা ভবানীর ভৈরব সন্নিধানে প্রত্যাবর্তনের কথা মনে করিয়া দিবে—আমি জানিব কি করিয়া। ষড়ানন্দ ঠিকই বলিয়াছে। আমিই যত অনর্থের সৃষ্টি করি। কেন আমাকে মা শব হইতে জীবে পরিবর্তিত করিল। ঠাকুরের প্রতি অভিমানও হইল।

ঠাকুর বলিলেন—পূর্ণাদা, খোঁজ করিয়া দেখ, নিকটেই কোন দেবালয় আছে কি না? আমি শুনিতে পাইতেছি—বিদ্যার্থীদের পাঠাভ্যাসের গুঞ্জন। কোন অধ্যাপকের চতুষ্পাঠী বলিয়া অনুমান করি। একটু বিস্তৃত সংবাদ নিয়া আস। আমি ষড়ানন্দ সহ ভৈরবের তীরে বসিয়া আছি। স্থানটি বড় মনোরম। সাহসে ভর

করিয়া ষড়ানন্দ মাতুল সর্বানন্দকে বলিল, মাতুল, তুমি আমাকে স্নেহ কর না। মাতুলানী আমাকে কত স্নেহ করিত। তাঁহার অনুগ্রহেই 'ত' আমি মায়ের গৌরবর্ণ অঙ্গুলী দুইটির দর্শন পাইয়াছিলাম। তোমাকে কিছু বলিতেই ভয় হয়।

সর্বানন্দ স্নেহভরে ষড়ানন্দকে কাছে ডাকিয়া আনিলেন; বলিলেন, 'তোর যা জিজ্ঞাসা অকপটে আমাকে বল। আজ আমি কল্পতরু। যাহা চাহিবি, সব পাবি'। ষড়ানন্দের জীবনে এমন শুভ মুহূর্ত আর আসিবে কিনা আমরা জানিনা, তবে এটা সত্যি, সর্বানন্দের এই মূর্তি ইতঃ পূর্বে আর কেউ দেখে নাই। দেখে নাই নিত্য সহচর পূর্ণানন্দও। সর্বানন্দ আজ অন্য মানুষ। ষড়ানন্দ আকাশ পাতাল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না। বাঞ্ছাকল্পতরুর কাছে কি চাইবে। তিনি 'ত' দিবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কি চাহিব। ষড়ানন্দ বলিলেন, ঠাকুর তোমার দর্শন, তোমার সঙ্গ, তোমার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে পূর্ণ কাম করিয়াছে। আমার আর কি চাহিবার আছে? তোমার শ্রীপাদদর্শন আমার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অধিক বলিয়াই আমি মনে করি। একটি প্রার্থনা—আমি মাতুল গৃহে বসবাসের সময়ে বড় মামা আগমাচার্যের মুখে শুনিয়াছিলাম তোমাদের বংশের কে যেন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল! আমি জানিতে চাহিলে আমাকে বলা হইতনা। আমার জানিতে ইচ্ছা করে, সেই কাহিনীটি।

সর্বানন্দ বলিলেন—আমার পিতৃদেব শম্ভুনাথ ভট্টাচার্যকে দেখিয়াছ। আমার পিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্যকে তুমি দেখ নাই। আমি ও দেখি নাই। কিন্তু ভাগ্যবান্ পূর্ণাদা তাঁহাকে দেখিয়াছে। তাঁহার সঙ্গ পাইয়াছে। কত আদর্শবান্ স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, পূর্ণাদা'র মুখে শুনিয়াছি। তুমি যে ঘটনাটির ইঙ্গিত আমাকে দিয়াছ—উহা পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কিত। সেই ঘটনার বিবরণ তোমাকে দিতেছি।

আমার প্রপিতামহের নাম বসুদেব কিনা—জানি না। কারণ বসুদেবের পুত্রই 'ত' বাসুদেব। দেখ, জগতে পুত্রের পরিচিতিতে অনেক সময় পিতৃ নামের কোন সার্থকতাই থাকে না। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ জগৎ পূজ্য কিন্তু বসুদেবকে কয়জন মনে করে। গিরিরাজ দুহিতা পার্বতী জগৎ পূজ্যা, ত্রিদশ পূজিতা—গিরিরাজ হিমালয়, হিমালয় কি অনুরূপভাবে পূজিত। আমার পিতামহ বাসুদেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। জপ, তপ, তপস্যা তাহার জীবনের এক মাত্র ব্রত। পরমার্থ চিন্তায় তাঁহার প্রায় অহোরাত্র অতিবাহিত হইত। প্রায়ই গঙ্গাতীরে বসিয়া জপ করিতেন। ইষ্টের দর্শনে জীবন পাতের সংকল্পের কথাও কখনও কখন মনে হইত।

একদিন বাসুদেবের গৃহে তাঁহার অনুপস্থিতিতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব গৃহিনী তখন গৃহে একা। দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকটি আসিয়া বাসুদেব জায়ার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন, আমি তোমার বাড়ীতে আশ্রয় চাই। গৃহকর্ত্রী বলিলেন, আপনাকে আমি জানি না। আপনার পরিচয় জানা প্রয়োজন। আপনার নাম এবং বাসস্থানের পরিচয় পাইলেই আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। অজ্ঞাত কুলশীলকে আশ্রয় দেওয়ার অসম্মতির কথা তিনি তাহাকে জানাইয়া দিলেন।

আগন্তুক স্ত্রীলোকটি বলিলেন, ভদ্রে, আমি আমার পরিচয়, নাম, ধাম ইত্যাদি জানাইবার প্রয়োজন মনে করি না। আমি তোমার বাড়ীতে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। আমাকে থাকিতে দিবে কি না? বল। বাসুদেব গৃহিনী বলিলেন—আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিলে আমার প্রত্যবায় হইবে, আমি জানি,—কিন্তু আমি শুনিয়াছি—অজ্ঞাত কুলশীলকে কখনও আশ্রয় দিতে নাই, বিশেষতঃ আমার পতি দেবতা গৃহে নাই। আমি নিরুপায়। আমি স্ত্রীলোক—এ বিষয়ে আমার অধিকার অত্যন্ত সীমিত। আগন্তুক

স্ত্রীলোকটি বাসুদেব জায়ার কথায় কোন প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন তিনি গৃহকর্ত্তা বাসুদেবের উদ্দেশ্যে তাল পাতায় একটি শ্লোক লিখিয়া ঘরের চালের নীচে বাতায় গুঁজিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাসুদেব অন্যান্য দিনের মত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পত্নীর নিকটে আগন্তুক মহিলার সংবাদ জানিলেন এবং ঘরের চালে গোঁজা লিপিটি পাঠ করিয়া গামছা মাত্র সম্বল করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ পত্নী নিজের অপরাধ ভাবিয়া স্বামীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন—বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অজ্ঞান। আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ আপনি ভিন্ন কে ক্ষমা করিবে। পতিই স্ত্রীর একমাত্র দেবতা। আমাকে বলুন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? কখন ফিরিবেন।

আমার পিতামহ (বাসুদেব) যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, যেই স্ত্রীলোকটির সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল, যিনি আমার উদ্দেশ্যে একখানা লিপিকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শন লাভের জন্য বাহির হইলাম। অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা হইলেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব।

বাসুদেব তারপর দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে কঠোর তপস্যা করিলেন। 'অজপা' জপে নিজকে দিবারাত্র মগ্ন করিয়া রাখিতেন। দেবীর আসন টলিল—দৈববাণী হইল, 'বাসুদেব, তুমি এই উগ্র তপস্যা হইতে বিরত হও। তোমার তপস্যার ফল নিশ্চয়ই পাইবে—তাহা 'পৌত্রান্তে ফলপ্রসূ' জানিবে। তোমার এই শরীর আমার দর্শন পাইবে না। তোমার পুত্র শম্ভুনাথের পুত্র সর্বানন্দ আমার দর্শন লাভ করিবে। দর্শন লাভের স্থান মাতঙ্গাশ্রম।' পিতামহের একনিষ্ঠ ভক্ত পূর্ণানন্দকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ছোট কাল হইতেই সে বাসুদেব গৃহে লালিত পালিত পুত্র সম স্নেহে বর্দ্ধিতও।

বাসুদেব পূর্ণানন্দকে এই দৈববাণীর কথা বলিয়াছিলেন।

আমাদের পূর্ব পুরুষের মেহারে আগমন রাজা শিবানন্দের রাজত্ব কালে—এই সমস্ত পুরাতন ঘটনা সবই সকলের জানা—আশা করি তোমার জিজ্ঞাসার সমস্তই বলা হইল।

পূর্ণানন্দ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিল, ঠাকুর, তুমি 'ত' অন্তর্যামী, তোমার এই পূর্ণাদা'কে অত কষ্ট দাও কেন? তোমার কি মায়া হয় না। জানি—মায়া মোহ, রাগ, দ্বেষ তোমার কিছুই নাই। তবে যখন দেহ ধারণ করিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াও, তখন আমাদের কিছু চাওয়াটা কি অন্যায়। তোমার নির্দেশ মত অনুসন্ধানে জানিলাম—খুব নিকটেই বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রচূড় আগমবাগীশের বাড়ী। তুমি ছাত্রদের বিদ্যাভ্যাসের ধ্বনি শুনিয়াছিলে—তাঁহারই চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থীদের। শুনিলাম এরূপ বিখ্যাত তান্ত্রিক, তন্ত্র বিশারদ পণ্ডিত এতদঞ্চলে নাই।

সর্বানন্দের আনন্দ হইল। মনে মনে মা ভবানীকে প্রণতি নিবেদন করিয়া বলিলেন—মা, রহস্যময়ী, লীলাময়ী এখন কোন লীলায় আমাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে কোন অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইতে অভিলাষ করিয়াছ? মা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ আগমবাগীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গুরুদেব সর্বানন্দের কথা বলিল। আগমবাগীশ তৎক্ষণাৎ আসিয়া সর্বানন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া গৃহে আনিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত, সকলকে বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা করিয়া অধ্যাপক আগমবাগীশ ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। যথাকালে আহার্য্য আসিল। সর্বানন্দ, ষড়ানন্দ এবং পূর্ণানন্দ আহারে বসিলেন। কিন্তু সর্বানন্দের আহারে অতৃপ্তির ব্যাপারটি পণ্ডিত চন্দ্রচূড়ের চোখ এড়াইতে পারিল না।

আহারান্তে সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পণ্ডিত চন্দ্রচূড়ের দৃষ্টি প্রখর। তিনি জাগিয়া রহিলেন—প্রথম হইতেই

তিনি সর্বানন্দকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। দেখিলেন—সর্বানন্দ, জপ করিতেছেন। সঙ্গী দু'জন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। জপের নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়া সর্বানন্দকে একজন বড় তন্ত্র সাধক বলিয়া পণ্ডিত চন্দ্রচূড় আগমবাগীশের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

'উক্তৈবতৎ কুলনাথোঽসৌ সেনহট্টং যযৌ মুদা।'

'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী'তে এই পংক্তিটি অবলম্বনে আমরা জানিতে পারি—সর্বানন্দ (সেনহট্ট) সেনহাটী গমন করেন।

এই সেনহাটীর একটু সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাঠকদের উপহার দিতে চাই।

বর্তমান খুলনা জেলা পূর্বে যশোহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খুলনা বলিয়া পৃথক্ কোন জিলা ছিলনা। ঐ জিলারই অন্তঃপাতি গ্রাম সেনহাটী। ধনে জনে কুলে মানে বহু জনের আবাস এই গ্রামটি ৫০০/৬০০ বৎসর পূর্বের কথা বলিতে আমরা অসমর্থ কিন্তু পরবর্তী যুগে বিগত একশত / দেড়শত বৎসর ইতিহাস সেনহাটীকে একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছে। ইংরেজী এবং সংস্কৃত উভয় বিদ্যার চর্চা এই গ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্ভবতঃ আজও এ ধারা অব্যাহত।

যশোহর-রাজের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন চন্দ্রচূড় আগমবাগীশ। তিনি বাস করিতেন সেনহাটী গ্রামে। মধ্যে মধ্যে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম আলোচনা ছিল দ্বারপণ্ডিতের প্রধান কাজ। পন্ডিত চন্দ্রচূড়ের এখন বয়স হইয়াছে। যাতায়াতের ক্লেশে তিনি আর পূর্বের মত রাজ দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন না। এদিকে সর্বানন্দকে দেখিয়া আগমবাগীশ মহাশয় ভাবিলেন,—'যদি এই পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে আমার উত্তরাধিকারীরূপে যশোহরের দ্বারপণ্ডিত রূপে নিযুক্ত করিবার সংকল্প সফল করিতে পারি, তাহা হইলে

আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। রাজদরবারেও আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে।'

পরদিন যথাসময়ে ষড়ানন্দ, পূর্ণানন্দ শয্যা ত্যাগ করিল। সর্বানন্দ পূর্বেই উঠিয়া আগমবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে শাস্ত্র আলাপ করিতেছেন—পূর্ণানন্দ দেখিলেন। ভাবিলেন—অত বড় পন্ডিতের সঙ্গে গুরুদেব কি সুন্দর আলোচনা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে আগমবাগীশ মহাশয়ের 'সাধু, সাধু'—ধ্বনির মধ্য হইতে পূর্ণানন্দ বুঝিতে পারিলেন—গুরুদেবের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত। বিনয়ী সর্বানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার নিকটে তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। বিশেষতঃ আগমবাগীশের প্রকাণ্ড 'লাইব্রেরী' যাহার অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য তন্ত্র সাহিত্যে সমৃদ্ধ—দেখিয়া সর্বানন্দ বিস্মিত হইয়াছিলেন। যোগ্য শিষ্যের সাক্ষাৎকার যেমন গুরুর তুষ্টি উৎপাদন করে, তেমন সুযোগ্য অধ্যাপকের দর্শনে শিষ্যের আনন্দ স্বতঃই উৎসারিত হয়

পূর্ণানন্দ, ষড়ানন্দ আগমবাগীশের গৃহে সুখেই দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে। সর্বানন্দের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে ধীরে ধীরে সেই টুকুও কমিয়া আসিতে লাগিল। সর্বানন্দের তন্ত্র সাধনা ও গ্রন্থ রচনার উপযোগী গ্রন্থের সন্ধান সমানে চলিল। আগমবাগীশ যোগ্য শিষ্যকে পাইয়া অত্যন্ত ভাগ্যশালী বলিয়া নিজেকে মনে করিতে লাগিলেন।

একদিন যশোহর রাজ দরবার হইতে সংবাদ আসিল। আগমবাগীশ মহাশয়কে যশোহর রাজ দরবারে যাইতে হইবে। রাজার অনুরোধ, তিনি যেন পত্রবাহকের সঙ্গেই, প্রয়োজন হইলে শিবিকারোহণেই যশোহর চলিয়া আসেন। পত্র বাহকের নিকট শুনিতে পাইলেন—'রাজ সভায় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে। তিনি দরবারে উপস্থিত হইয়াই রাজাকে

বলিলেন—মহারাজ, আমি আপনার সভা পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে চাই। রাজা পণ্ডিতের সদম্ভ উক্তিতে দুঃখবোধ করিলেও শিষ্টাচার বশতঃ তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিলেন এবং পণ্ডিত সভা আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।' তাহার পরই আমার (পত্রবাহকের) আপনার এখানে আসা।

আগমবাগীশ সমস্ত সংবাদ জানিয়া একটু চিন্তা ক্লিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন—এই বৃদ্ধ বয়সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয় না। এই বয়সে যেমন জয়ের আনন্দে নিজের খুব একটা আত্ম তুষ্টি আসিবে না, তেমন পরাজয়ের গ্লানি কিন্তু সুনামের যথেষ্ট হানি ঘটাইবে। এখনও 'ত' একেবারে বিগত স্পৃহ হইতে পারি নাই।

অধ্যাপক মহাশয় অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি যথাকালে সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। গৃহস্থালীর কাজকর্মেও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। সর্বানন্দ সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি আগমবাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পণ্ডিত মহাশয়, আপনি কি কোন অমূলক আতংকে আতঙ্কিত হইতেছেন ?' সর্বানন্দের কথা শুনিয়া আগমবাগীশ অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে খুলিয়া বলিলেন। অধ্যাপক মহাশয়কে সর্বানন্দ বলিলেন, 'দেব, আপনি চিন্তা করিবেন না। মহামায়ার ইচ্ছায় সমস্তই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে। আপনি অত বড় পণ্ডিত আপনার চিন্তার কি আছে।'

পূর্বে বিচার সভায় ছাত্রের যোগদানও স্বীকৃত হইত। প্রবীণ অধ্যাপকগণ প্রথম বিরুদ্ধ পক্ষকে ছাত্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেন। ছাত্র বিচারে পরাজয় মানিলেই অধ্যাপক বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন।

আগমবাগীশের মনে আশা জাগিল। তবে কি সর্বানন্দ বিচার সভায় উপস্থিত হইবে। আবার চিন্তা করিলেন—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত বিচার ছেলেখেলা নহে। বহুবার এজাতীয় বিচারে

যশোহর রাজসভায় বিজয়ীর জয়মাল্য আমি পাইয়াছি। সর্বানন্দ মাত্র অল্পদিন হয় এখানে আসিয়াছে—একেবারে নূতন। বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ বটে কিন্তু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যে বিবিধশাস্ত্র পারঙ্গম, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র।

সর্বানন্দ বলিলেন—'অধ্যাপক মহাশয়, চিন্তা করিবেন না। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছি।' যশোহরের রাজবাড়ীতে খবর পাঠান হইল। আগমবাগীশ মহাশয় অসুস্থ, আশা করা হইতেছে, সত্বরই সুস্থ হইবেন। অনুরোধ—বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিনটির পরিবর্তন করিয়া অন্য যে কোন একটি দিন নির্ধারণ করা হউক।

সংবাদ জানিয়া যশোহররাজ বিচারের দিন পরিবর্তন করিলেন। উভয় পক্ষকেই পত্র দ্বারা পত্রবাহকের মাধ্যমে সংবাদ পাঠান হইল।

নির্ধারিত দিবসে রাজসভায় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন। যশোহররাজ দ্বারপন্ডিত মহাশয়ের আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন। হঠাৎ শিবিকারোহণে দ্বারপণ্ডিত মহাশয়কে সভায় আসিতে দেখা গেল। রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া সসম্মানে তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দেখা গেল, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সভায় অনুপস্থিত। তৎক্ষণাৎ সংবাদ আসিল—গত রাত্রে দিগ্বিজয়ী পন্ডিত স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তাহার শয্যা পার্শ্বে একখানি চিরকূট পাওয়া গেল—

রাজাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা লিপিটি—

"দ্বারপণ্ডিত আগমবাগীশের বাড়ীতে এক সিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেছেন। তিনি আগমবাগীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে জয়ের আশা নাই—এই স্বপ্নাদেশ আমাকে বিচারে পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য করিল। পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তি চাই।"

রাজসভা সেদিনকার মত ভঙ্গ হইল। আগমবাগীশ মহাশয় সেনহাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। অধ্যাপক আগমবাগীশের মনে পূর্বের নিরানন্দ ভাবটা কাটিয়াছে বটে কিন্তু সংশয় গিয়াছে কি?

বিচক্ষণ আগমবাগীশের সিদ্ধান্ত—"এ সর্বানন্দের কোন কৌশল, যাহাতে দিগ্বিজয়ী পলায়নে বাধ্য হইল।"

সর্বানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে সর্বানন্দ উত্তরে বলিলেন—'সবই মহামায়ার ইচ্ছা।'

পণ্ডিত আগমবাগীশের শিষ্যের উপর স্নেহ, বাৎসল্য, কৃতজ্ঞতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগমবাগীশ সর্বানন্দকে বলিলেন—বৎস, তুমি আমাকে অধ্যাপক রূপে বৃত করিয়াছ, আমিও যোগ্য শিষ্য হিসেবে তোমাকে পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আমি কৃতজ্ঞ। তোমার আচরণ আমাকে, আমার পরিবারের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি প্রস্তাব করি—তুমি আমার বিবাহ যোগ্যা কন্যা 'স্বয়ংপ্রভাকে' (গৌরী দেবী) বিবাহ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত কর।

ঠাকুর সর্বানন্দ এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভাবিলেন—গুরু ঋণ কিছুটা পরিশোধ হইবে। যথা সময়ে শুভ-লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইল। পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ ব্যতীত বরপক্ষের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না।

আগমবাগীশ মহাশয়ের বিরাট 'গ্রন্হাগার' সর্বানন্দকে পূর্বেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। বহু তন্ত্রের দুর্লভ গ্রন্হ এখানে তিনি দেখিয়াছিলেন। মনোনিবেশ করিলেন গ্রন্হ রচনায়। আগমবাগীশ মহাশয়ের আশীর্বাদে গ্রন্হ রচনার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এখানেই তিনি তন্ত্র শাস্ত্রের অদ্বিতীয় নির্ভর যোগ্য গ্রন্হ "সর্বোল্লাস তন্ত্র" রচনা করেন।

কয়েক বৎসর শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া স্বয়ংপ্রভার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে সর্বানন্দ কাশীধাম গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুত্র শিবানন্দ, স্ত্রী স্বয়ংপ্রভা অধ্যাপক আগমবাগীশের নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করিতেছেন।

আগমবাগীশ মহাশয় সর্বানন্দের যাত্রা পথে অন্তরায় সৃষ্টি

হউক— এ প্রকার কোন চিন্তাই মনে স্থান দিলেন না, কারণ, তিনি জানিতেন—সর্বানন্দ মুক্ত পুরুষ। সংসার গণ্ডীতে তাহাকে রাখা যাইবে না।

কাশীধাম যাত্রার পূর্বে শিষ্য ও গুরুর মধ্যে তন্ত্র সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়। আগমবাগীশ মহাশয় সর্বানন্দকে বলিলেন, দেখ, বাপু, বর্তমানে তন্ত্র বা তান্ত্রিক সম্পর্কে লোকের ধারণা স্বচ্ছ নহে। প্রথমতঃ শাস্ত্র জ্ঞানের অভাব, দ্বিতীয়তঃ সমাজ জীবন তন্ত্রালোচনায় যোগ্য লোকের অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগিতেছে। এই উৎকট ব্যাধি হইতে তাহাদের কে নিরাময় করিবে? তুমি বিদ্বান সাধক, বীরাচারের সাধনার সুযোগ্য অধিকারী, মাতৃ কৃপাপ্রাপ্ত বিরল ব্যক্তিদের অন্যতম। আমার মনে হয়—তোমার আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া বর্তমান সমাজ বহুভাবে উপকৃত হইবে। ভবরোগ-ক্লিষ্ট জনগণের তুমিই এক মাত্র বৈদ্য। এই সংকট কালে তুমিই একমাত্র আশার আলো। অনাচার, অত্যাচ্যর, অনুষ্ঠানসর্বস্ব গোড়ামী, ব্যভিচার সমস্ত সমাজ জীবনকে কলঙ্কিত করিতেছে। তন্ত্র সাধনার এরূপ দুর্দিন পূর্বে আর আসে নাই।

সর্বানন্দ এই অবস্থা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। মহামায়ার কৃপায় হতাশার কালমেঘ কাটিয়া গেল। সুন্দর এবং ত্রুটী মুক্ত, ভেদভাব বর্জিত, পবিত্র মাতৃ ভাবের সাধনায় তন্ত্র সাধনাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পরা বিদ্যার, পরা তত্ত্বের মাতৃ ভাবে উপাসনার এই পদ্ধতির পথিকৃৎ সর্বানন্দ দেব।

জগন্মাতা নিজে আসিয়া সর্বানন্দকে পুত্ররূপে স্বীকার করেন। ইহাই 'ত' মাতৃ ভাবে সাধনা। এই মাতৃভাবের ধারাটি পরবর্তী কালে জন জীবনে অব্যাহত ছিল, যার ফলে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণদেব, বামাক্ষ্যাপা প্রভৃতি সাধকগণকে আমরা দেখিতে পাইলাম।

ইহারা সকলেই মাতৃ ভাবে সাধনা করিয়া মহামায়ার কৃপাধন্য হইয়াছেন।

আজ আমাদের মনে একটা জিজ্ঞাসা—

ভাগ্যবান্ ষড়ানন্দ ব্যক্তিটি কে? সর্বানন্দের কোন ভগিনীর কথা আমরা ইতঃ পূর্বে জানিতে পারি নাই। পিতৃদেব শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য কখনও নিজ পুত্র কন্যাদের কথা বলেন নাই। তাহার কোন কথাই পৌত্র শিবনাথ তাহার 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী'তে উল্লেখ করেন নাই। এজন্য অবশ্য গ্রন্থকর্তার কোন ত্রুটির কথা নয়, কারণ তিনি সর্বানন্দ জীবন চরিত লিখিতে বসিয়া তাহার পিসিমার কথা উল্লেখ না করিলে 'ত্রুটি' বলিয়া গণ্য করিবার কি হেতু আছে? পিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শিবনাথ তাঁহার গ্রন্থে ষড়ানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র কয়েকটি শ্লোকে। শ্লোক সংখ্যা ৬০, ৬৪, ৭১, ৭৪, ৭৬, ৯১। এতদ্ভিন্ন ষড়ানন্দ মহামায়ার স্তব করিয়াছেন আরও ৭টি শ্লোকে। শ্লোক সংখ্যা ৬৫-৬৯।৭২।৭৩। আমরা এখানে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের ন্যূনতা প্রদর্শনের ইচ্ছায় বিষয়টি উত্থাপন করি নাই।

প্রশ্ন জাগে—রাজার মনোগত ভাব অবগত হইয়া 'পরমানন্দঃ' ঈষৎ হাসিয়া 'সর্বানন্দ গৃহিণীর নিকট রাজার দেওয়া 'শাল' খানি নিয়া আসিবার জন্য একটি লোককে প্রেরণ করিলেন। তিনিই ষড়ানন্দ। ভাগিনেয় ষড়ানন্দ। সর্বানন্দের জীবন নাট্যে প্রথম দেখা গেল। যোগবলে যোগী পুরুষ কি ষড়ানন্দকে সৃষ্টি করিলেন! রাজসভায়, আগমাচার্য্যের গৃহে অথবা সর্বানন্দের সঙ্গে পূর্ণানন্দ ব্যতীত কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব আমরা কি দেখিয়াছি? স্বভাবতঃই সংশয় জাগে অসীম শক্তি সম্পন্ন মাতৃ-কৃপাধন্য সর্বানন্দের অলৌকিক ক্ষমতার ইহা বহিঃ প্রকাশ কিনা? কেনই বা ষড়ানন্দ সেই দিন হইতেই সর্বানন্দের অনুচর। কি সুকৃতির অধিকারী এই নাম গোত্রহীন ষড়ানন্দ। তবে কি আমাদের সংশয় নিশ্চিত রূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। ধন্য

ষড়ানন্দ। সর্বানন্দের মানস সৃষ্টি, সর্বানন্দের মানস প্রতিমা, আমাদের অন্তরে তুমি চির জাগরূক।

মেহার ত্যাগের সময়ে ছায়া সঙ্গী পূর্ণানন্দ ব্যতীত আমরা দেখি ষড়ানন্দও সঙ্গে আছে। পূর্ণানন্দের ত্যাগের সীমা নাই। এমন মহনীয় চরিত্র, জগতে বিরল। সাক্ষাৎ মাতৃ দর্শন তাহাকে আরও মহিমান্বিত করিয়াছে। অবশ্য পূর্ণানন্দ বলেন—'গুরু কৃপায় আমার এ সব হইয়াছে। আমি ঋণী, কৃতজ্ঞ'। সত্যিই কি তাই। পূর্ণানন্দ কি কৃপালাভের যোগ্য বলিয়া নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই; কিন্তু ষড়ানন্দের সৌভাগ্য কি সর্বানন্দের 'মানস প্রতিমা'— এই জন্যই। না, অন্য কিছু!

পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন—সর্বানন্দ মেহার লীলা শেষে বারাণসী অভিমুখে যাত্রার সময়ে পূর্ণানন্দ তাঁহার সাথী। পূর্ণানন্দের মত ষড়ানন্দও মাতৃ কৃপা ধন্য। তাই ঠাকুরের প্রীতি লাভে সমর্থ। আমরা কি ষড়ানন্দকে জীনতরু মূলে একবারের জন্যও দেখিয়াছি। আমরা কি কখনও ষড়ানন্দকে মাতুলের সেবা পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়াছি। দেখি নাই—তবে ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ষড়ানন্দের মাতৃদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন সর্বানন্দ নিজে। মাতুল গৃহে উপস্থিত হইয়া রাজার দেওয়া 'শাল খানি দাও। শাল খানি দাও' বলিয়া গগন ভেদী চিৎকার মাতুলানীর কর্ণগোচর হয় নাই। তিনি নিকটেই এক প্রতিবেশীর গৃহে ছিলেন কিন্তু ষড়ানন্দের আবেগভরা আহ্বান বহুদূরে, অনেকদূরে, ভূলোক, গোলোক, দ্যুলোক ভেদিয়া ভবানীর কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। এটাই ডাকার মত ডাক। সাধনা। ভক্তের বিড়ম্বনায় মা অবতীর্ণ।

আগতা তারিণী তত্র বরদা ভক্ত বৎসলা।
গৃহান্ধস্তং বিনিঃসার্য্য তৎ স্বরূপং পটং দদৌ॥

ভক্ত বৎসলা জগত্তারিণী তখন তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহ হইতে

হাত বাড়াইয়া 'তৎ স্বরূপ' বস্ত্র প্রদান করিলেন। ষড়ানন্দ দেখিলেন, প্রত্যক্ষ করিলেন অপরূপ রূপ মাধুরী। জগদম্বার হেম রত্ন খচিত কঙ্কন হাতের শোভা, আর ঐ হস্তের নখ সমূহে কোটি সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রমার আভা বিদ্যমান।

ভাবুক পাঠক, আর কি সুকৃতির প্রয়োজন? সর্বানন্দই 'ত' মাতৃ দর্শনের পূর্ণ সুযোগ তাঁহাকে করিয়া দিলেন। অজ্ঞানান্ধকার জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তিরোহিত করিয়া মাতৃ দর্শনে নেত্রদ্বয়কে উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এখন পূণাদার সহযোগী হইবে—ইহাতে চমৎকৃত হইলে চলিবে কেন?

অনেকে প্রশ্ন তুলিতে পারেন—দেখা যায় পূর্ণানন্দকে ষড়ানন্দ কখনও মাঝে মধ্যে মাতুল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা কোথায়! সর্বানন্দদেব পূর্ণানন্দকে 'পূণাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন—ইহা আমাদের সকলেরই জানা। মাতুলের ভাইকে (পূণাদাকে) ভাগিনেয় 'মাতুল' সম্বোধন করিবার মধ্যে অযৌক্তিকতার কোন কিছু আছে কি? যদি আপনাদের এই আহ্বান রুচি সম্মত না নয় তাহা হইলে ষড়ানন্দও 'পূণাদা' বলিয়াই পূর্ণানন্দকে সম্বোধন করিবে।

আমরা দেবস্থানে পুত্রকন্যা, নাতি, নাতনীকে প্রণাম করিয়া মাতৃ মূর্তি দেখাই। বলি—মাকে প্রণাম কর। তাহারাও আদেশ মত মাতৃ চরণে প্রণত হয়। বর প্রার্থনা করে—মাগো, আমাকে বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও। এখানে দেখুন—পিতার যিনি 'মা',—পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনীর তিনিও মা-ই। ঠাকুরমা বা দিদিমা নন। পূর্ণানন্দও আজ সকলের পূণাদা।

বারাণসী

সেনহাটীর লীলা শেষে শ্রীমৎ সর্বানন্দ দেবের সঙ্গী পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ সহ তিনি বারাণসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কোন পিছুটানই তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। আগমবাগীশের পুত্রসম বাৎসল্য, আত্মীয়তা, আতিথেয়তা সর্বানন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবেন—ইহা চিন্তারও অতীত। আজ তাঁহার মন যে অসীমের সন্ধানে নিয়ত ছুটিয়া চলিয়াছে।

বারাণসী ধামে পেঁাছিয়াই বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাস্নান, মাতা অন্নপূর্ণার পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন—সবই করিলেন। কিন্তু মানসিক ভাবে তিনি কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না। যেন কিসের অভাব তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

কাশীধামে আসিয়া সঙ্গীদের নিয়া দিন যাপন নিরুপদ্রবেই চলিতেছিল। সর্বানন্দদেবের বাহিরের আচরণে জানিবার উপায় ছিল না। তাঁহার হৃদয়ে কিসের অভাব। তাঁহার আন্তরিক বেদনা! বারাণসীধামও তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না।

কাশীর দণ্ডীসমাজ খুবই প্রসিদ্ধ। বহু দণ্ডী বিশ্বনাথের আশ্রয়ে থাকিয়া নিত্য স্নান, অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া প্রাত্যহিক জীবন যাপন করিতেন। ভক্ত গৃহী মাত্রই নিজেদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য—"দণ্ডী ভোজন করাইলে মা অন্নপূর্ণা, বাবা বিশ্বনাথ তুষ্ট হন" এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া দণ্ডীদের আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে আনয়নের ব্যবস্থা করিতেন। সমাগত দণ্ডীগণ আহারান্তে ভক্তিমান্ গৃহীকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিতেন। এই ছিল সেদিনকার কাশীর সমাজে একটা প্রচলিত ব্যবস্থা। ফলে, সমাজে দণ্ডীদের খুব সম্মান ও মর্য্যাদা। জন সাধারণ ইহাদের বেশ সমীহ করিয়াই চলিত। এমন একটা কথাও প্রচলিত—দণ্ডীরা ব্যক্তিগত ভাবে খুবই শান্ত। কিন্তু একত্রে

মিলিত হইলে অর্থাৎ দণ্ডীসমাজ তাঁহাদের স্বার্থে কোন প্রকার ঘা' লাগিলে (তাঁহারা) ক্ষিপ্ত হইয়া বিরাট অনর্থের সূচনা করিতে পারেন। এই ভয়ে কেহই প্রায়শঃ তাঁহাদের সহিত বিবাদ বাঁধে, তেমন কোন ব্যাপারেই উৎসাহ বোধ করিত না। সকলেই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিত।

সর্বানন্দদেব, অবধূত সর্বানন্দদেব যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মাতৃ সাধক মুখে মাতৃ নাম, আচার আচরণে বীরাচারী সাধকের লক্ষণ সুস্পষ্ট। আহার বিহারে কোন সংযম অর্থাৎ বাধা-বিচার আছে বলিয়া মনে হয় না। কাশীর দণ্ডী সমাজ এই সাধকটিকে দেখিয়া প্রথম হইতেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। ধীরে ধীরে অবধূতের সমাজ গর্হিত আচার আচরণ প্রকাশ হইতে লাগিল। একদিন সকলে মিলিয়া অবধূতকে (সর্বানন্দকে) তাড়া করিবার মনস্থ করিল। তাহাদের ইচ্ছা—এই অবধূতকে কাশী ছাড়া করিয়া ছাড়িবে।

সর্বানন্দ ইহাদের অভিসন্ধি পূর্বেই জানিতে পারিলেন। দণ্ডী প্রধানদের নিকটে সশরীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কূট অভিসন্ধির বিষয়ে সাবধান করিয়া বলিলেন, আপনারা যেই পথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা সাধু পথ নহে। এই অশিষ্ট আচরণ কাশীর দণ্ডী সমাজের গায়েই কলঙ্ক লেপন করিবে।

সর্বানন্দদেব প্রথমে দণ্ডীদের সহিত সংঘর্ষে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু ঘটনা চক্রে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে একটি বক্রপথ অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। অবধূত সর্বানন্দের বিনীত, ও অমায়িক ব্যবহার অনেক দণ্ডীকেই আকৃষ্ট করিল। অন্যান্য দণ্ডীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দণ্ডী প্রধানগণ স্থির করিল, 'অবধূতজীর সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই।' ইত্যবসরে বিনয়ের সাক্ষাৎ অবতার, অতি মৃদুভাষী, সৌম্য দর্শন অবধূতজী দণ্ডীদের

আবাসে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজনের সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। দণ্ডীরা হৃষ্ট চিত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইয়া অবধূতের গৃহে আমিষ আহার্য্য পরিবেশন করিতে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত দণ্ডীগণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

'বীরাচারী সাধকের পক্ষে ইষ্ট দেবীকে উৎসর্গিত দ্রব্যই (আমি) আপনাদের আহার্য্য রূপে উপস্থিত করিয়াছি। মা জগত্তারিণী হাসি মুখেই 'ত' আমার নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের ইহাতে আপত্তি হইবে—আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি—আগামী কল্য সাত্ত্বিক আহার্য্য আপনাদিগকে পরিবেশন করা হইবে। আপনারা তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করিবেন। আমার এই অনুরোধ আপনারা রক্ষা করুন।'

দণ্ডীগণ অবধূতের আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—অতি উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী, সাত্ত্বিক আহারের সুবন্দোবস্ত। চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সবই বিদ্যমান। দণ্ডীগণ সারিবদ্ধ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলেন। সযত্নে আহার্য্য পরিবেশিত হইল। দণ্ডীগণ যথারীতি আহার্য্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া একে অন্যের দিকে তাকাইয়া আছেন। একজন বলিয়া উঠিলেন—'আমার আহার্য্যে মদ্য মাংস মাছের গন্ধ।' সঙ্গে সঙ্গে অপরেরাও বলিয়া উঠিলেন—আমরাও ঐ একই গন্ধ পাইতেছি। একি অন্যায়, অবধূত আমাদের জব্দ করিবার জন্য এ কৌশল নিয়াছে।

সর্বানন্দ বলিলেন, মহাত্মাগণ, আপনারা ভুল করিতেছেন। মা অনপূর্ণা জগত্তারিণী ভবানীর ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যই আপনাদের পরিবেশন করা হইয়াছে। উপরের দিকে হাত তুলিয়া প্রণতি জানাইয়া জগদম্বাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'মা, তোমার প্রসাদের অবমাননা করিয়া ইহারা যে অপরাধ করিতেছে, তাহারা

কি করিতেছে, তাহারা জানে না। তুমি তাহাদের ক্ষমা করিও।'

শাপ-শাপান্ত করিতে করিতে দণ্ডীরা অবধূতের আবাস ত্যাগ করিল।

সেদিন হইতে অনাহার ক্লিষ্ট দণ্ডীগণ বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া তীর্থান্তরে গমন করিতে আরম্ভ করে। গৃহে গিয়াও তাহারা আহারের সময় খাদ্য দ্রব্যে মদ্য মাংস প্রভৃতির গন্ধ অনুভব করিত। হায় রে, সম্প্রদায়! এই সম্প্রদায় ভেদ--মানুষকে অমানুষে পরিণত করে।

সর্বানন্দদেব বারাণসীতে আরও কিছুদিন কাটাইয়া পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ সহ সমস্ত দেব দেবী দর্শন সমাপ্ত করিলেন।

একদিন রাত্রিতে সর্বানন্দদেব পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন 'দেখ, আমার লীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি আর লোকালয়ে থাকিব না। দেবতাত্মা হিমালয়, আমার মায়ের আবাস ভূমি, হিমালয় দুহিতা জগজ্জননী মা জগদম্বার ক্রোড় দেশ আমার পরবর্ত্তী গন্তব্য স্থল'।

সর্বানন্দদেব পুনরায় বলিলেন—মৎস্য সূক্তে একটি শ্লোক, যাহা আজ আমার স্মৃতি পথে উদিত হইয়া আমাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধিস্তথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্বতানাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথাবরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা॥
তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্।
সর্বকাম প্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতম্॥
কীর্তনং দেবদেবস্য হরস্য মতমেব চ।
পাবনং শ্রদ্দধানামিহ লোকে পরত্র চ॥

দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু সর্ব প্রধান। হ্রদ সমূহের মধ্যে সাগর

শ্রেষ্ঠ। নদীর মধ্যে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। পর্বত সমূহের মধ্যে হিমালয় মহান্। সমস্ত বৃক্ষ হইতে অশ্বত্থ শ্রেষ্ঠ। রাজাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান। দেবীগণের মধ্যে দুর্গা সর্বোত্তমা। যেমন বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য। সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্র শাস্ত্র সর্বোত্তম। এই তন্ত্র শাস্ত্র সর্বকামদ বেদ সম্মত পুণ্য গ্রন্থ। ইহাতে দেবাদিদেব শিবের মতাদর্শের কীর্ত্তন। এই তন্ত্র শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ ইহ জন্মে এবং পর জন্মে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইবেন।

আমার বিরচিত 'সর্বোল্লাস তন্ত্র' বীরাচারী সাধকগণের পক্ষে অমূল্য গ্রন্থ। ৬৪ খানি তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্লোক রত্নের সমাহার রহিয়াছে এই গ্রন্থে। সেনহাটীতে পণ্ডিত আগমবাগীশের অমূল্য পুস্তক ভাণ্ডারের গ্রন্থরাজি ব্যবহারেব সুযোগ পাইয়া আমাকে দিয়া মা জগদম্বা ইহা সম্পন্ন করাইয়াছেন।

আজ যেমন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে, সেরূপ অতীত এবং অতীতের কিছু কিছু ঘটনা আমার চোখের সামনে উপস্থিত হইতেছে। মনে পড়ে জনক-জননীর কথা, আরও কত কি!

সেনহাটীতে সর্বানন্দদেব প্রায় দশবৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন—অনেক ইতিহাসবেত্তা এই অভিমত পোষণ করেন। শ্রীমৎ সর্বানন্দ দেবের জন্ম ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ। তিনি সিদ্ধিলাভ করেন ১৪২৬ খৃঃ অর্থাৎ ৩৮ বৎসর বয়সে জগন্মাতা ভবতারিণীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। সিদ্ধিলাভের পর মাত্র বৎসর দুই মেহারের লীলা। এই সময়ে নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মেহার-বাসী জনসাধারণ। মেহারের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নিকট, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ছিলেন 'চলমান বিশ্বনাথ,' শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব 'প্রত্যক্ষ ভগবান্'।

এই সময়ের একটি ঘটনা—একদিন শ্রীঠাকুর আপন মনে বসিয়া আছেন—ভবতারিণীর চিন্তায় মগ্ন। একটি লোকের চিৎকারে

ঠাকুরের দৃষ্টি লোকটির প্রতি নিবিষ্ট হয়। লোকটি আভূমি প্রণত হইয়া নিবেদন করিল—"ঠাকুর, আমার বাবা গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আমার মায়ের বিশ্বাস আপনি দোয়া করিলে, একবার আমার বাবাকে স্পর্শ করিলেই তিনি হাটাচলার শক্তি ফিরিয়া পাইবেন।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব তখনই সেই কৃষকদম্পতির গৃহে ছুটিয়া যান। তাঁহার করস্পর্শে আহত চলচ্ছক্তি লাভ করে।

সাধক সর্বানন্দ সেনহাটীতে অবস্থান কালে পণ্ডিত প্রবর চন্দ্রচূড় আগমবাগীশ মহাশয়ের প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারটির (লাইব্রেরী) পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি এই সময়ে কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আজ আমরা ঐ সমস্ত গ্রন্থের সন্ধান জানি না। মাত্র তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান এখন পাওয়া যায়। (১) সর্বোল্লাসতন্ত্র। (২) নবার্ণব পূজা পদ্ধতি (৩) ত্রিপুরার্চনদীপিকা।

এতদ্ব্যতীত তিনি সেনহাটীতেই বীরাচার সম্মত দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। নরহরি কবীন্দ্র বিশ্বাস নামক একজন ভক্তিমান গৃহস্থকে সর্বানন্দ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে এই নরহরি কবীন্দ্র বিশ্বাস বীরাচার সম্মত দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করেন।

এখানে সর্বোল্লাসতন্ত্রের বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের কিঞ্চিৎ অবহিত করিতে ইচ্ছা করি।

এই তন্ত্রখানি ৬৪ উল্লাসে বিভক্ত। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব একটি 'উল্লাস নির্ণয়' রচনা করিয়া প্রত্যেক উল্লাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপ বর্ণনা দিয়াছেন।

প্রথম উল্লাস হইতে ষোড়শ উল্লাসের বিষয়ঃ—প্রকৃতির লক্ষণ, শাস্ত্রে দেবতার মূর্তি কল্পনা, নিগম ও আগমের লক্ষণ (১)। তন্ত্র সমূহের নাম (২)। সৃষ্টির উৎপত্তি

সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা (৩—৫)। সৃষ্টির লয় বিষয়ক বর্ণনা (৬)। ভাবের লক্ষণ (৭)। আচারের লক্ষণ, কুমারীর লক্ষণ (৮)। ভাবাদি নামের লক্ষণ (৯)। শ্রীগুরুর ধ্যান (১০)। শ্রীগুরুর লক্ষণ (১১)। বৈষ্ণবাচার (১২)। ভক্তিবিষয়ক আলোচনা (১৩)। বলির লক্ষণ (১৪)। অষ্টাঙ্গ যোগ, বৈষ্ণবাচার এবং শৈবাচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা (১৫)। বিভাব পশু, বিভাব-বীরলক্ষণ, পঞ্চতত্ত্ব এবং পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প ও তিলক প্রমাণ (১৬)।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব বীরাচারের প্রভূত তথ্য সমৃদ্ধ এই গ্রন্থের সপ্তদশ উল্লাস হইতে সপ্তবিংশ উল্লাস পর্যন্ত বিবৃত বিষয়গুলি ঃ—

যন্ত্রের লক্ষণ (১৭)। বাম ও দক্ষিণ ভেদে শাক্তাচারের বিবরণ, পশ্বাচারের নিন্দা নিরূপণ (১৮)। সাধকের লক্ষণ, দিব্যচক্রের লক্ষণ, বীরচক্রের লক্ষণ (১৯)। চক্রের স্থান, আসন, চক্রমধ্যে লক্ষণ (২০)। চক্রমধ্যে জাতির অভেদ, দ্রব্য নিরূপণ প্রভৃতি (২১)। পাত্র নির্ণয়, আধার নির্ণয়, পাত্র ও আধারের লক্ষণ নিরূপণ (২২)। আত্মতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা (২৩)। দ্রব্যাভেদ, শক্তি শুদ্ধি বিষয়ে বর্ণনা (২৪)। আত্মতত্ত্বের শোধন (২৫)। আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর ধ্যান, সংক্ষেপে দ্রব্য শোধন (২৬)। মাংস, মৎস্য, মুদ্রার লক্ষণ ও শুদ্ধি বিষয় (২৭)।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব সর্বোল্লাসতন্ত্রে অষ্টাবিংশতি উল্লাস হইতে ছাপ্পান্ন উল্লাস পর্যন্ত এই কয়টি উল্লাসে বীরাচারের সাধনা বিষয়ে শক্তি, শ্রীচক্র, পাত্র এবং আধার প্রভৃতি অতীব রহস্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

শক্তির লক্ষণ (২৮)। শক্তি শোধন (২৯)। সম্বিদা বিষয়ক বর্ণনা (৩০)। শ্রীচক্র, পাত্র ও আধারের লক্ষণ (৩১)। সাধক ও পাত্র সমূহের নানা প্রকারের বর্ণনা (৩২)। বটুকাদি বলির বিবরণ

(৩৩)। ন্যাস তর্পণাদি কর্ম (৩৪)। প্রার্থনা ও পাত্র বন্ধনের বিষয় (৩৫)। নিয়ম ও পাত্র লক্ষণ (৩৬)। শ্রীগুরুর ধ্যান (৩৭)। মধুপ্রদানের প্রমাণ (৩৮)। পঞ্চমের বিধান (৩৯)। ক্রীড়াদির লক্ষণ (৪০)। পঞ্চমানন্দ কথন (৪১)।

আনন্দ সাধকের লক্ষণ (৪২)। দশ আনন্দ পাত্রের লক্ষণ (৪৩)। পঞ্চমের লক্ষণ (৪৪)। আনন্দ স্তোত্র (৪৫)। অভিষেক (৪৬)। দক্ষিণাচার বীরের ভাব (৪৭)। বামাচার ও পুষ্পবিষয়ক আলোচনা (৪৮)। পুষ্পশোধনের মন্ত্র ও বিধান (৪৯)। কুলস্ত্রীর লক্ষণ (৫০)। মৈথুনের লক্ষণ (৫১)। শক্তি-জ্ঞান প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা (৫২)। সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ (৫৩)। পূর্ণানন্দের লক্ষণ (৫৪)। পূর্ণানন্দ মাহাত্ম্য (৫৫)। শক্ত্যানন্দ লক্ষণ (৫৬)।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব সর্বোল্লাস তন্ত্রে সাতান্ন উল্লাস হইতে চৌষট্টি উল্লাস পর্যন্ত—এই কয়টি উল্লাসে অতি নিগূঢ় তথ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

শক্তির মাহাত্ম্য (৫৭)। হংসবীজের মাহাত্ম্য কথন (৫৮)। ধ্যানত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন (৫৯)। দিব্যাচারক্রম (৬০)। কৌলাচার (৬১)। প্রকৃতি স্বরূপ লক্ষণ (৬২)। ব্রহ্মজ্ঞান (৬৩)। জীবন্মুক্তি (৬৪)। এই চৌষট্টি উল্লাসেই গ্রন্থ সমাপ্ত।

"ত্রিষষ্ঠৌ ব্রহ্মণো জ্ঞানং জীবন্মুক্তস্ততঃ পরম্।
চতুষষ্ঠৌ সমাপ্তশ্চ গ্রন্থোল্লাস-যথোদিতঃ ॥"
ইত্যুল্লাস নির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

এইভাবে গ্রন্থটির বিস্তৃত তথ্য 'উল্লাস নির্ণয়ে' বিবৃত হইয়াছে।

যদিও শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব উল্লাসগুলির সূচী বর্ণনায় ৬৪ উল্লাসে গ্রন্থ সমাপ্তির কথা ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা মাত্র ৬৩ উল্লাস পর্যন্ত গ্রন্থখানির সন্ধান পাইয়াছি। শেষ উল্লাস

'জীবন্মুক্তি'। এখনও এ উল্লাসটির কোন পাণ্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় উল্লাসটির অভাব তন্ত্র-সাধকগণের নিকট বিরাট ক্ষতি। অনুসন্ধান চলিতেছে—কখনও আবিষ্কৃত হইলে তান্ত্রিক সমাজ উপকৃত হইবেন—সন্দেহ নাই।

এই অবকাশে পাঠকগণের দৃষ্টি একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ রাখিতে অনুরোধ করি। 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী' প্রণেতা পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্যের নিকট আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা। ভক্ত পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই এই কৌতূহলের আপনারাও অংশীদার।

'শ্রীসর্বানন্দ শর্মাহং বাসুদেব সুতাত্মজঃ।
পুত্রোঽহং শম্ভুনাথস্য……॥'

আমরা শ্রীমৎ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থখানিকে শ্রীমৎ সর্বানন্দ জীবনের একটি তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য করি। এই গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে সর্বানন্দ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া এ ৫০০ / ৬০০ বৎসরে বহু গল্প কাহিনী রচিত হইয়াছে। আমাদের ভাবিতে অবাক্ মনে হয়—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য, তিনি শ্রীমৎ সর্বানন্দ পুত্র। পিতা পুত্রকে দেখিয়াছেন। পুত্রও পিতার সান্নিধ্যে সাংসারিক কাজ কর্মে তাঁহাকে (পিতাকে) সাহায্য করিয়াছেন। এ সংবাদ আমরা 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী' তে পাই। কিন্তু সর্বানন্দ পিতা শম্ভুনাথ সম্পর্কে পৌত্র শিবনাথ নির্বাক্ কেন? পিতামহী সম্পর্কেও ত কিছু বলা হয় নাই। শিবনাথের চোখে হয়তঃ শম্ভুনাথ সহধর্মিণী ততটা মনোগ্রাহ্য নন কিন্তু সর্বানন্দ জননী বলিয়া তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। ইহা ভুলিলে চলিবে না। সর্বানন্দ অযোনীসম্ভব নহেন। তিনি শম্ভুনাথের ঔরসে তাঁহার সহধর্মিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী'-কার নীরব কেন? এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে শ্রীমৎ সর্বানন্দ লীলায় যাঁহাদের প্রত্যক্ষ সহযোগ

আছে শুধু তাঁহাদের নিয়াই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। এই যুক্তিও তেমন জোরালো বলিয়া মনে হয় না।

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকিকে আমরা স্মরণ করি। অত্যন্ত নিন্দিত চরিত্র কৈকেয়ীকে তাঁহার অমর কাব্য 'রামায়ণে' স্থান নাও দিতে পারিতেন। রামায়ণে কৈকেয়ী চরিত্রের অভাব থাকিলে কি অসুবিধা হইত। রাণী সুমিত্রাকে আমরা কতটা দেখিয়াছি। কিন্তু কেহই কিন্তু বাল্মীকির চোখে উপেক্ষণীয়া নহেন। ভরতের মত পুত্র যে জননী গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন অপরাধ কি গ্রাহ্যের মধ্যে আসে। একমাত্র ভরত জননী বলিয়াই আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণে তাঁহাকে বিশিষ্ট স্থানে বসাইয়াছেন। আজ শিবনাথ ভট্টাচার্য্যের মস্যাধারে একটু মসীও কি ছিল না। যাহাতে শম্ভুনাথ গৃহিনীর নামটি অঙ্কিত হইতে পারিত। বংশপঞ্জীতে দেখা যায়। শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের ৪ পুত্র। ১। আগমাচার্য্য ২। সর্বানন্দ ৩। গঙ্গেশ ৪। গদাধর। শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্যের অনবধানতা একথা আমরা বলিব না। তবে প্রশ্নটা থাকিয়া গেল। এরূপ অসম্পূর্ণ আরও কিছু বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি হইতে 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী'-কার নিষ্কৃতি পাইবেন না। এখানে আমরা ঐ বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

কেহ কেহ অবশ্য এ মত পোষণ করেন যে শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের পুত্রের নামে অন্য কোন পণ্ডিত সর্ববিদ্যা এ গ্রন্থটির রচয়িতা। তাঁহার পক্ষে আমাদের সংশয়গুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। বহুদিনের ঘটনার কিম্বদন্তীরূপে যাহা শ্রুতিগোচর হইয়াছে তাহাতে শম্ভুনাথ বা তাঁহার সহধর্মিণীর কোন পরিচিতি বা উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য তাহার জানা ছিল না। কিন্তু শিবনাথ এ কৈফিয়ৎ দিয়া আমাদের নিরস্ত করিতে পারিবেন না। শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব যখন সিদ্ধ মহাপুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যা

জগত্তারিণীর পুত্ররূপে স্বীকৃত হন তখন সে বেশ বড়। সাবালক।

রাজা শিবনাথকে বলিয়াছেন—

......ক্ষুব্ধোঽহং তৎসুতে শিবনাথকে।
অবদং তদ্ বিশেষণ্ড নিষেধং পুনরাগমে॥
শিবনাথোঽপি তচ্ছ্রুত্বা বদন্মাতৃপদাম্বুজে।
ভ্রাতৃ পত্নী সুতাদ্যৈশ্চ ভর্ৎসিতঃ সন্ পুনঃ পুনঃ॥

রাজা শিবনাথকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি যেন আর রাজবাড়ীতে না আসেন। শিবনাথও গৃহে গিয়া মায়ের নিকট সমস্ত বলিলেন। তৎপর ভ্রাতা, পত্নী ও পুত্রগণ সর্বানন্দকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করেন।

সুতরাং শিবনাথ যথেষ্ট বুদ্ধিমান্ ও সংসারী সুগৃহস্থ। রাজার অসন্তুষ্টি পরিবারের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ভাবিয়া সমস্ত ঘটনা সকলকে বিশেষ করিয়া আগমাচার্য্যকে বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছিলেন।

এখানে একমাত্র সান্ত্বনা এখনও বহু তথ্য, প্রমাণ শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব সম্পর্কে আমাদের অজানা। মনে হয়—এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে অনেক বিষয় আমাদের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রায় সমসাময়িক শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্পর্কেও বহু অজানা তথ্য ধীরে ধীরে গবেষকদের হাতে আসিতেছে। এমন সব চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মহাপ্রভুর মৃত্যুর রহস্য কি এখনও উদ্ঘাটিত হইয়াছে? চৈতন্য ভক্তগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল। বহু সংস্থা, সংগঠন, মহাপ্রভুর জীবনী চর্য্যায় ব্যাপৃত।

দুঃখের বিষয় হইলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই—শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব সম্পর্কে এজাতীয় কোন সংস্থা বা সংগঠন এ কার্য্যে মনোনিবেশ করে নাই। কতিপয় অনুরাগী সর্ববিদ্যা শিষ্য, ভক্ত, স্বকীয় একক প্রচেষ্টায় শ্রীমৎ সর্বানন্দদেবের সম্পর্কে প্রামাণ্য

তথ্যাদি সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে উহা সর্বসাধারণে প্রচারিত হইবে। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে জানিবার আকাঙ্ক্ষা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইবে—এই আশায় আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

আপনাদের আমরা একটু অন্যমুখী করিয়া তুলিয়াছি। শ্রীমৎ সর্বানন্দ দেবের দিব্য জীবন আলোচনায় এই বিষয়গুলি অপরিহার্য্য বলিয়া আলোচিত হইল।

আসুন, আমরা দেখি পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দের মানসিক অবস্থা কি?—শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব অবধূতজী মাতৃ ক্রোড়ে আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল।

শ্রীমৎ সর্বানন্দদেব পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দকে কাশী বাস করিয়া বাবা বিশ্বনাথের ও মা অন্নপূর্ণার সেবায় আত্ম নিয়োগ করিতে পরামর্শ দিলেন।

অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী সম্পর্কে তাহাদের বলিলেন—'এই স্থানের মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। জীব মাত্রই এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়। স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর কর্ণে নাম প্রদান করেন। কাশী ধাম সংসারী জীবের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিবে'।

এই মর্মভেদী কথা পূর্ণানন্দকে শোক বিহবল করিয়া তুলিল। সে ঠাকুরের চরণ যুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

'ঠাকুর আমাদের কি হইবে। আমরা কোথায় যাইব।'

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার—ষড়ানন্দের কোন অনুভূতি নাই। সে যেন সংবাদ শুনিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। মুখে কোন শব্দ নাই। অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। যেন কিছু প্রার্থনা কিন্তু মুখে কোন কথা নাই।

সর্বানন্দ তাহাদের বলিলেন, তোমরা অধীর হইও না।

তোমরা পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে অবস্থান কর। ইষ্টমন্ত্র অনুধ্যান কর। তোমাদের সদ্‌গতি হইবে। তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর—আমি কিছু উপদেশ এবং তত্ত্ব কথা তোমাদের বলিব। এই বলিয়া ঠাকুর ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। নয়ন যুগল মুদ্রিত প্রায়। যেন অশরীরী বাণীর মত ঠাকুরের কথা পরম ভক্ত পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ শুনিতে লাগিলেন—

দেবতাত্মা হিমালয়

আমি আমার মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইব। হিমগিরি, হিমালয়, প্রস্তরময়, দুর্গম, কিন্তু পুণ্যস্রোতা কল্লোলিনী নদীর উৎস এই হিমালয়। বহু দেবদেবীর আবাস ভূমি। পর্বত রাজ কন্যা, মা উমা এখানেই বাস করেন। দেবাদিদেব শিবের বাস ভূমি। অসংখ্য মুনি ঋষির তপোভূমি। আমার লীলা শেষ—আমি মাতৃ ক্রোড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বদরিকাশ্রমের পুণ্যভূমি আমাকে টানিতেছে।
আমি দেখিতেছি—কেদারনাথ, দেখিতেছি বদরিবিশালের মন্দির, আরও কত পুণ্যতীর্থ যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া জগতে শান্তির প্রহরী রূপে অবস্থান করিতেছে।

ভক্ত পাঠকগণ মনে হয় ঠাকুরের জন্মান্তরের বিস্মৃত প্রায় স্মৃতিগুলি আজ একের পর একটা মানস পটে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সর্বানন্দ দেবকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দ যাহা অনুভব করিলেন—অশরীরী বাণীর শ্রাবণ প্রত্যক্ষ করিলেন—তাহাই এখানে বিবৃত হইতেছে। ভক্ত সজ্জন এই অনুভূতির কিঞ্চিৎ রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইবেন।

বারাণসী হইতে সর্বানন্দদেব মনোরথে হরিদ্বার, হৃষিকেশ হইয়া হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন। প্রথমেই কেদারনাথের কথা মনে পড়িল। পথে দেখিলেন যেন বহু পরিচিত দেব প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ। নীচে বহিয়া চলিয়াছে মন্দাকিনী ও অলকানন্দা। স্বচ্ছ পবিত্র জলধারা স্পর্শে মানুষের মনঃ প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। ত্রিযুগী নারায়ণ—'এই ত্রিযুগী নারায়ণে হরপার্বতীর বিবাহ বাসর' —এরূপ একটি কথা শুনা যায়। মন্দিরের প্রাঙ্গণে চারটি কুণ্ড আছে। সেগুলি ব্রহ্মা, রুদ্র, সরস্বতী, বিষ্ণু কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ।

অদূরে সোম প্রয়াগ,—বাসুকীগঙ্গা নামে আর একটি

স্রোতস্বিনীর সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ প্রসিদ্ধ উপাখ্যানটির কথা এখানে মনে পড়ে 'মুণ্ড কাটা গণেশ' দেখিলেই। কথিত আছে—গ্রহদেব শনির কোপ দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড এই স্থানেই দেহচ্যুত হয়।

অবশেষে কেদারনাথের দর্শন। মন্দাকিনী পুণ্য সলিল বর্ষণ করিতে করিতে যেন শ্রান্ত পথিকদের ক্লান্তি অপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়াছে।

ঠাকুরের বহু আকাঙ্ক্ষিত বদরী নারায়ণ, বদরী বিশাল। বদরিকাশ্রম। এই বদরিকাশ্রমে ভগবান্ বদরীনারায়ণ তপস্যা করিবার জন্য অবস্থান করিতেছেন। এজন্য লক্ষ্মীদেবী মন্দিরাভ্যন্তরে না থাকিয়া অন্য মন্দিরে পৃথক্‌ভাবে রহিয়াছেন। কুবের, গণেশ, উদ্ধব, গরুড়, লক্ষ্মী, নারদও নরনারায়ণ ঋষির অবস্থানও দৃষ্টি গোচর হয়।

বদরীনাথ বিগ্রহ সম্পর্কে একটা পুরাণ প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ বিষ্ণু দ্বাপরে অবতীর্ণ হইবার প্রাক্‌কালে দেবগণ তাঁহাকে বদরীভূমি পরিত্যাগ না করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 'কলিযুগে নরগণ পাপাচরণে লিপ্ত এবং ধর্মকর্ম হীন হইয়া ভয়ানক এক দুর্যোগ সমাজ জীবনে দেখা দিবে। কাজে কাজেই তখন প্রত্যক্ষভাবে আমার এ বদরীক্ষেত্রে থাকা সম্ভব হইবেনা। দেবগণ, তোমরা অধীর হইও না। আমি 'আমাকে সাক্ষাৎ দর্শনের ফল' যাহাতে লাভ হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিতেছি। কল্লোলিনী পতিতোদ্ধারিণী অলকানন্দার মধ্যস্থিত নারদকুণ্ডে আমার এক দিব্য মূর্ত্তি আছে। তাহা উত্তোলন করিয়া তোমরা স্থাপন কর। তোমাদের স্থাপিত শালগ্রাম শিলায় ধ্যানমগ্ন চতুর্ভুজ মূর্তিই—আমার মূর্তি জানিবে।"

সেইদিন হইতেই এ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ভগবান্

শঙ্করাচার্য্যও শ্রীশ্রীবদরীবিশালের মূর্তিটির যথাযোগ্য সম্মাননার পর পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন।

এই বদরিকাশ্রমের উত্তর দিকে অলকানন্দার তীরে পিতৃতীর্থ ব্রহ্মকপাল। এই ব্রহ্মকপাল সম্বন্ধে একটি সুপ্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী—

দেবাদিদেব শিব ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কন্যার প্রতি ধাবমান ব্রহ্মাকে শিব নিষেধ করেন, এরূপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশও করিলেন। ব্রহ্মার এই অসংযমের জন্য ক্রোধান্বিত শিব ব্রহ্মার পঞ্চম শির ত্রিশূল দ্বারা ছেদন করেন। সেইদিন হইতে পঞ্চানন ব্রহ্মা চতুরানন ব্রহ্মারূপে পরিচিতি লাভ করেন।

এদিকে আর এক বিপত্তি—কর্তিত মুণ্ডটি ত্রিশূল হইতে আর ভূমিতে পড়িতেছে না। ত্রিশূলেই বিদ্ধ হইয়া রহিল। মহাদেব বিষ্ণুর শরণার্থী হইয়া এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন শিবকে আদেশ করিলেন—"তুমি সত্বর বদরীক্ষেত্রে গমন কর। স্থান মাহাত্ম্যে তোমার ত্রিশূল হইতে ব্রহ্মার পঞ্চম শির গুপ্ততীর্থের কুন্ড পার্শ্বে পতিত হইবে। পার্শ্বস্থ কুন্ডে অবগাহন করিয়া তুমি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিস্কৃতি পাইবে"।

ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে যথাস্থানে শিবের ত্রিশূল হইতে মুন্ডটি খসিয়া পড়িল। সেই স্থানটিকে এখন 'ব্রহ্ম কপাল' বলা হয়। এই ব্রহ্মকপাল বিখ্যাত পিতৃতীর্থ: এখানে পিতৃকুল, মাতৃকুল ও মৃত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের পিন্ডদানে 'গয়ায় পিন্ডদান অপেক্ষা আটগুণ অধিক ফল হয়।

কত ক্ষণ অতিবাহিত হইল। কে জানে। মন্ত্রমুগ্ধ পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তাহারা দেখিল ঠাকুর যেখানে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন—সেই আসনটি শূন্য। ষড়ানন্দ একটু ইতস্ততঃ অন্বেষণের চেষ্টা করিতেই পূর্ণানন্দ বলিল—আর সন্ধানের প্রয়োজন নাই।

বিশেষজ্ঞের অভিমত—

সর্বোল্লাসতন্ত্র ও সর্বানন্দ তরঙ্গিণীর রহস্য সন্ধানে

অবতরণিকা

বেদ ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রই জ্ঞানভাণ্ডার, উভয় শাস্ত্রেই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে জগতের সৃষ্টিতত্ত্বাবধি একেবারে তাহার মহানির্বাণ পর্যন্ত কিভাবে পরিচালিত হইতেছে—তৎসমস্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। চতুর্মুখ ব্রহ্মাই প্রতিকল্পে বেদের স্মরণ করিলে তাহা জগতে ঋষিদের ধ্যানযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।' আর তন্ত্রের প্রবক্তা স্বয়ং সগুণ ব্রহ্ম শিব-শক্তি। মূলতন্ত্র সমস্তই উভয়ের মুখনিঃসৃত বাণী। আমাদের আলোচ্য সর্বোল্লাস তন্ত্রাদিও তন্ত্রশাস্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ। তাহাতে তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতির বিশেষভাবে বীরাচারের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহই বিশদভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'সর্বোল্লাসতন্ত্র' গ্রন্থখানা সাধনা প্রভাবে জগন্মাতা দশমহাবিদ্যার প্রত্যক্ষ দর্শনকারী স্বয়ং সর্বানন্দনাথ বিরচিত হেতু অন্য সমস্ত তন্ত্র সংগ্রহ গ্রন্থাপেক্ষা মর্য্যাদা সম্পন্ন। সৌভাগ্যবশতঃ অতিদুষ্প্রাপ্য উক্ত গ্রন্থখানা বর্ত্তমানে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বীরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অশেষ চেষ্টায় ও প্রচুর অর্থব্যয়ে বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে। ইহা দ্বারা তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ ও তন্ত্রের মর্মার্থ জিজ্ঞাসু সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর ননীগোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের 'উল্লাস প্রকাশ' নামক বঙ্গভাষার অনুবাদ ও তন্ত্রশাস্ত্রে তদীয় গভীর পান্ডিত্য এবং তদর্থ প্রকাশে অপূর্ব দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। একে তো তন্ত্রশাস্ত্র পারিভাষিক শব্দ বহুল, পন্ডিত সাধারণেরও দুর্বোধ্য নিগূঢ় তত্ত্বে সমাচ্ছন্ন হেতু তদীয় তত্ত্ব লৌকিক ভাষায় প্রকাশযোগ্য হইতে পারে

না, একমাত্র গুরূপদেশগম্যই তাহা হইয়া থাকে, তথাপি সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের অপূর্ব দক্ষতায় সেই সকল দুর্বোধ্য তত্ত্বেরও আলোক বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা আশা করি—তন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন সকলেই এই অনুবাদের সাহায্যে তান্ত্রিক গূঢ় তত্ত্বেরও কিঞ্চিৎ আলোক দর্শনে সক্ষম হইতে পারেন। এজন্য অনুবাদক মহাশয় সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অপর গ্রন্থ 'সর্বানন্দ তরঙ্গিণী', যাহাতে—তৎকালীন মেহার রাজ জটাধর ও বৈদিক ধর্মের একনিষ্ঠ সাধক, ঘোর তন্ত্র বিদ্বেষী সন্ন্যাসি-প্রবর দণ্ডীস্বামী দ্বয়ের সংবাদে সর্বোল্লাস তন্ত্রোক্ত বামাচারাদি গূঢ় তত্ত্বেরই আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজা জটাধর নিজেই তাহা তরঙ্গিণীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা

"বহুতন্ত্রে বহুমতং বিবিধং শিবভাষিতম্।
তেষামুদ্ধৃত্য যত্নেন শ্রীনাথেন যথোদিতম্ ॥১১০
শ্রীসর্বোল্লাসকে গ্রন্থে তস্মাদুদ্ধৃত্য যত্নতঃ।
কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি যৎসারং সাবধানোঽবধারয়" ॥১১১

অতএব ইহা সর্বোল্লাসতন্ত্রেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হেতু সর্বোল্লাসতন্ত্রেই তদীয় সমস্ত তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হওয়ায় এখানে আর তাহার পৃথক্ আলোচনা নিরর্থক। এজন্যই বোধ হয় অনুবাদক মহাশয়ও তাহার অনুবাদকে 'ভাবানুবাদ' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। পরিশেষে আমি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বহুল প্রচার কামনা পূর্বক জগজ্জননী ৺ মহামায়ার নিকট তাহাদের অনুবাদক প্রকাশক উভয়ের প্রতি অশেষ আশীর্বাদ বর্ষিত হউক—ইহাই একান্ত কামনা।

৫৮ রায়পুর, পোঃ গড়িয়া
কলিকাতা—৮৪ শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র তর্কতীর্থ
১৮ই পৌষ, ১৩৯৮ বাংলা

৮/৭এ, বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২

SARBBANANDERA DIBYAJIBA